# পাঁচজন দুষ্টু ছেলে

বাংলাপিডিএফ.নেট

সুমন্ত আসলাম

বাংলাপিডিএফ.নেট
এক্সক্লিউসিভ!

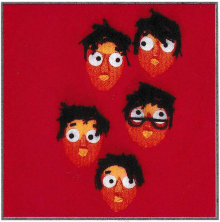

রিন্টু, দোদুল, রিমন, দীপ্র আর নূরুল—পাঁচজন দুষ্টু ছেলে। ওরা বন্ধু, ওদের একটাই কাজ—কোনো অন্যায় দেখলেই তার প্রতিবাদ করা। ওরা পাখির বাসা দেখে, পাখির বাচ্চাদের যত্ন নেয়, ক্রিকেট খেলে, দলবেঁধে মানুষের সেবা করে, আবার দুষ্টুমিও করে।

বেশ কদিন ধরে ওরা খেয়াল করছে—একজন মানুষ সবসময় ওদের পিছে পিছে ঘোরে, একটু দূরে থেকে ওদের কাজকর্মের প্রতি নজর রাখে, কিন্তু কাছে আসে না। লোকটার প্রতি ওরা আগ্রহী হয়ে ওঠে একদিন, এবার ওরা পিছে লাগে তার। অবশেষে একটা পুরাতন দালানের ভেতর লোকটাকে ঢুকতে দেখে, পিছে পিছে ওরাও ঢোকে। কিন্তু সেখানে ঢুকেই চোখগুলো বড় বড় হয়ে যায় তাদের।

এ কী দেখছে তারা!

প্রচ্ছদ ■ ধ্রুব এষ

# দয়া করে এড়িয়ে যাবেন না

বাংলাপিডিএফ এ আপলোডকৃত বইসমূহ আপনার নিজের ওয়েবসাইট/ব্লগ/সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করার সময় দয়া করে অরিজিনাল আপলোডারদের ক্রেডিট দিন। দিনে দিনে পিডিএফ বইয়ের সংখ্যা যে কমে আসছে তার অন্যতম প্রধাণ কারন অবাধে এক ওয়েবসাইটের বই অন্য ওয়েবসাইটে কোন প্রকার মেনশন করা ছাড়াই শেয়ার করা। এর মধ্যে কেউ কেউ তো আবার আরেকজনের আপলোড করা বই ওয়াটারমার্ক লাগিয়ে নিজের বলেও চালিয়ে দিচ্ছেন। এটা খুব দ্রুত বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাপিডিএফ থেকেও অনেক আপলোডার হারিয়ে গেছেন শুধুমাত্র এইসব পিডিএফ চুরির কারনে। অল্প গুটিকয়েক যেসব আপলোডার আছেন, তাদেরও অনেকে নিয়মিত পিডিএফ আপলোডে উৎসাহ পান না। কাজেই তাদের ধরে রাখার দায়িত্বটা আপনাদের পাঠকদের নিতে হবে। আমাদের বই শেয়ার করেন, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু দয়া করে ওয়েবসাইটের নাম উল্লেখ করে করুন। এতে আপনাদের ওয়েবসাইটের ভিজিটর কিন্তু কমে যাবে না, উলটো সবাই আপনাদের সততার প্রশংসাই করবে। পিডিএফ কমিউনিটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না।

বাংলাপিডিএফ এ ডোনেট করতে চাইলে সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে পেপালের মাধ্যমে করতে পারবেন। আর বিকাশ নাম্বার প্রয়োজন হলে মেইল করুনঃ banglapdf@yahoo.com এই ঠিকানায়!

ধন্যবাদ সবাইকে।

**Banglapdf.net**

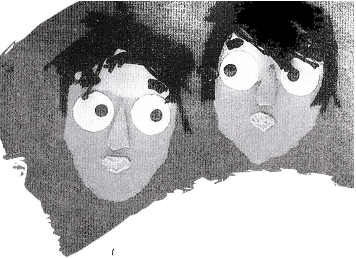

# পাঁচজন দুষ্টু ছেলে

সুমন্ত আসলাম

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০৪
তৃতীয় মুদ্রণ ❑ জুন ২০০৪
চতুর্থ মুদ্রণ ❑ সেপ্টেম্বর ২০০৬

স্বত্ব ❑ লেখক

প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা

মুদ্রণ ❑ হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড ঢাকা

দাম ❑ পঁয়ষট্টি টাকা

ISBN 984 412 393 3

যুক্তরাজ্য পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড
২২, ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

আমেরিকা পরিবেশক ❑ মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

মুগ্ধ হয়ে আমি যখন ওদের দিকে তাকাই, তখন আমি আমাকে দেখতে পাই, আমি আমার শিশুকাল দেখতে পাই, আমার সোনা-ছড়ানো শৈশব দেখতে পাই। ওরা তাই আমার প্রাণ, আমার আত্মার বাসিন্দা, আমার হৃদয়ের জানালা।

**জর্জ, জীম, জারীফ, জর্জি**

আমাদের অন্ধকার ঘরে এসেছিলে তোমরা, সে ঘর এখন আলোময়—তোমাদের আলোতে, তোমাদের স্পর্শে। বাবারা, তোমরা কি জানো—আমরা তোমাদের কত ভালোবাসি!

আমার কিশোর কিশোরী বন্ধুরা,

মাঝে মাঝে আমার খুব কষ্ট হয়—কেন আমি বড় হয়ে গেলাম! আমি আর কোনোদিন কোনো গাছের ডালে ঝুলে থাকতে পারব না ইচ্ছে মতো, খালের পানিতে ঝুপুর ঝুপুর করে গোসল করতে পারব না অনেকক্ষণ, পাখির বাসা খুঁজতে বেড়াতে পারব না জঙ্গলের ভেতর, এমন কি কোনো কুকুরের লেজে ঝারবাতি লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিতে পারব না যখন তখন।

কারণ আমি বড় হয়ে গেছি। আমার তাই কষ্ট।

প্রিয় বন্ধুরা, আমি যদি কখনো তোমাদের কাছে গিয়ে তোমাদের সাথে খেলতে চাই, তোমরা কি তাহলে আমাকে সাথে নেবে, আমাকে বন্ধু বানাবে?

**সুমন্ত আসলাম**
রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা
sumanto_aslam@hotmail.com.

ক্লাসের ভেতর রিন্টু একটু শব্দ করতেই চোখ দুটো বড় বড় করে তাকালেন রশীদ স্যার। কয়েক সেকেন্ড সেভাবে তাকিয়ে থেকে তিনি হাতের বেত দিয়ে ইশারা করলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে মুখটা কাচুমাচু করে উঠে দাঁড়াল রিন্টু। বেতটা নাচাতে নাচাতে স্যার এগিয়ে এলেন ওর দিকে। তারপর ওর বেঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে অসম্ভব রাগী রাগী চেহারা করে বললেন, 'ক্লাসের ভেতর শব্দ করলি কেন?'

মাথা চুলকাতে চুলকাতে রিন্টু বলল, 'কারণ আছে স্যার।'

'কি!' স্যার বেশ শব্দ করে বললেন।

'কারণ আছে স্যার।'

'বলেছি না ক্লাসে আজ শব্দ করা যাবে না, কোনো রকম শব্দ করা যাবে না!'

'আমি তো ইচ্ছে করে করিনি স্যার।'

'তার মানে কী দাঁড়াল, অন্যের ইচ্ছেতে শব্দ করেছিস, এই তো?'

'জি স্যার।'

স্যার চেহারাটা আরো রাগী রাগী করে বললেন, 'কার ইচ্ছেতে?'

'আমার মনের ইচ্ছেতে।'

'মন!' অবাক চোখে স্যার আরো একটু এগিয়ে এসে রিন্টুকে বললেন, 'কী বললি?'

'আমার মনের ইচ্ছেতে।'

'মনের ইচ্ছেতে!'

'জি স্যার।'

'তোর মন বলল, আর তুই তাই শব্দ করলি!'

'জি স্যার।'

'তোদের এতক্ষণ তাহলে কী বললাম গাধা! আজ আমাদের স্কুলে একজন স্কুল পরিদর্শক আসবেন এবং এসেই প্রথমে সিক্সের এই ক্লাসরুমে ঢুকবেন। তোর মনে নেই এটা?'

'জি স্যার, মনে আছে।'

‘তাহলে?’

‘মনের ওপর তো কারো হাত নেই স্যার।’

‘তাই, না? তা মন তোকে কী বলেছে?’

‘বলব স্যার?’

‘হ্যাঁ বল।’

‘আমাকে একটু হাসতে বলেছে।’

‘মানে?’

‘মানে স্যার, আমার আরো হাসি পাচ্ছে! কিছুক্ষণ হাসতে না পারলে পেট ফেটে মরে যাব আমি।’

‘পেট ফেটে মরে যাবি!’

‘জি স্যার।’

‘সত্যি মরে যাবি!’

‘জি স্যার। একটু ভেবে দেখুন স্যার, আমি পেট ফেটে মরে আছি আর সে সময় স্কুল পরিদর্শক স্যার ঢুকলেন ক্লাসের ভেতর। ব্যাপারটা কেমন বিশ্রী হয়ে যাবে না!’

‘জি-জ-জ-জি স্যার। আমারও তা-ই মনে হয়।’ পাশ থেকে রিমন উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে স্যারকে কথাটা বলল।

রশীদ স্যার রিমনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোরও তা-ই মনে হয়?’

‘জি-জ-জ-জি স্যার।’

‘তোর আর কী মনে হয়?’

‘রি-রি-রিন্টুকে কিছুক্ষণ হা-হাসতে দেওয়া উচিত।’

গভীর চোখে স্যার সবার দিকে তাকালেন। তারপর চেহারাটা স্বাভাবিক করে বললেন, ‘তোরা কী বলিস, রিন্টুকে কি কিছুক্ষণ হাসতে দেওয়া উচিত?’

কেউ কোনো কথা বলল না।

স্যার আবার সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আচ্ছা ঠিক আছে, কথা বলতে হবে না, যারা রিন্টুকে হাসতে দেওয়ার পক্ষে তারা হাত তোল।’

ক্লাসের সবাই হাত তুলেছে, কেবল একজন ছাড়া। স্যার তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘কিরে বাটলু, ক্লাসের সবাই হাত তুলেছে, তুই তুললি না কেন?’

ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাটলু বলল, ‘রিন্টুকে হাসতে দেখলে আমার ভীষণ রাগ হয়।’

‘কেন?’

'ওর মতো মিচকে শয়তান ক্লাসে আর একটিও নেই।'

স্যার রিন্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিরে, তুই বাটলুর সঙ্গে কী করেছিলি, ও তোকে শয়তান বলছে?'

'আমি তো কিছু করিনি স্যার।'

'মনে করে দেখ, কিছু করেছিস কি না।'

'ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। একদিন ও ক্লাসে নতুন একটা প্যান্ট পরে এসেছিল। কিন্তু প্যান্টটা সবাইকে এমনভাবে দেখাতে লাগল, যেন এ রকম প্যান্ট পৃথিবীতে আর একটিও নেই। তাই প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল।'

'রাগ হয়ে কী করলি?'

মাথাটা এমনি চুলকাতে চুলকাতে রিন্টু বলল, 'স্যার বলব?'

'হ্যাঁ বল।'

'এর জন্য আবার পিটুনি দেবেন না তো?'

'না বল।'

'বাটলুর এ রকম ভাব দেখে দোকান থেকে আমরা কয়েকজন মিলে সুপার গ্লু কিনে এনেছিলাম, তারপর বাটলু ক্লাসের বেঞ্চিতে বসতেই চুপে চুপে ওর প্যান্ট আর বেঞ্চের সঙ্গে বেশ কিছু সুপার গ্লু লাগিয়ে দিয়েছিলাম।'

'তারপর?' স্যার চোখ দুটো বড় বড় করে ফেলেছেন আবার।

'তারপর ও প্যান্টসহ আটকে গিয়েছিল বেঞ্চের সঙ্গে।'

'তারপর?'

'ক্লাস শেষ হওয়ার পর স্যার ক্লাস থেকে যখন বের হয়ে যান, তখন সবাই উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল কিন্তু ও উঠতে পারেনি।'

'তারপর?'

'শেষে ব্লেড দিয়ে ওর প্যান্টটা কেটে ওকে বেঞ্চ থেকে ছাড়াতে হয়।'

'তাহলে তো ওর...।'

'জি স্যার, প্যান্টটা কেটে ফেললে ও প্রায় ন্যাংটো হয়ে গিয়েছিল!'

'বলিস কি!' স্যার রিন্টুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাটলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর এত বড় কেলেঙ্কারি করল, আর তুই তো কিছুই বলিসনি আমাদের!'

বাটলু কিছু বলল না।

'কেন বলিসনি?'

'স্যার।' বাটলু ভয় ভয় চোখে বলল, 'বলতে আমি চেয়েছিলাম কিন্তু ওদের

গ্রুপের ভয়ে বলতে সাহস হয়নি।'

'ওদের গ্রুপ? ওদের গ্রুপটা আবার কী!'

'মিচকে শয়তান রিন্টু, চোখে চশমা পরা বুদ্ধিজীবী দোদুল, তোতলা রিমন, যেন কিছুই বোঝে না এ রকম ছদ্মবেশী দীপ্র আর পাখিবিশারদ নূরুল মিলে ওরা একটা গ্রুপ করেছে স্যার, ওদের গ্রুপের একটা নামও আছে স্যার।'

স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ছদ্মবেশী দীপ্র, তোদের গ্রুপের নামটা কী বলো তো?'

'ফাইভ ডট কম।'

'ওরে বাবা, জব্বর নাম তো!'

'জি স্যার।'

'তা তোদের কাজটা কী?'

'আসলে—।' আমি কথাটা বলার আগেই রিন্টু বেশ শব্দ করে বলল, 'স্যার, এটা সিক্রেট ব্যাপার, বলা যাবে না।'

স্যার অবাক হয়ে রিন্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা তোদের সবার নামের আগে বাটলু একটা করে বিশেষণ লাগিয়ে দিয়েছে, তোদের কেমন লাগে তা শুনতে?'

'মন্দ না, তবে স্যার আমরাও একটা নাম দিয়েছি ওকে।'

'কী?'

'প্যান্টকাটা ন্যাংটা বাটলু।'

হাসতে গিয়েই স্যার হাসি থামিয়ে ফেললেন। তারপর বাটলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওরা কি তোকে ভয় দেখিয়েছিল?'

'জি স্যার।'

'কী ভয় দেখিয়েছিল?'

'বলেছিল, আমি যদি এ ঘটনাটা স্যারদের বলে দিই, তাহলে ওরা পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুপার গ্লু মাখিয়ে একটা গাছের সঙ্গে নাকি আমাকে আটকে রাখবে, তারপর সারা গায়ে লাল পিঁপড়া ছেড়ে দেবে।'

'তাই নাকি!' স্যার আরো একটু বাটলুর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কাটা প্যান্ট নিয়ে যখন বাসায় গেলি, তখন তোর বাবা-মা কী বলেছিল?'

'মা কথাটা জিজ্ঞেস করতেই মাকে বলেছিলাম, কুকুরে কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।'

স্যার হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে তিনি রিন্টুর দিকে এগিয়ে

গিয়ে বললেন, 'কিরে, বাটলুর কথা শুনে কেমন লাগছে?'

মনে মনে ভীষণ রেগে গেল রিন্টু। কিন্তু খুব শান্ত স্বরে ও বলল, 'মন্দ না স্যার। ওর ভাগ্য ভালো, কুকুর শুধু ওর প্যান্ট ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, সত্যি সত্যি কামড় দেয়নি। এর পরের বার হয়তো কামড় দেবে, এমনকি ওর হাড়-মাংসও চিবিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে খেয়ে ফেলতে পারে।'

'আচ্ছা তোদের পাঁচজনের চারজনকে দেখছি, আরেকজন কই?'

'নূরুল এখনো আসেনি স্যার।' মুখটা হাসি হাসি স্যারকে বললাম আমি।

'কেন?'

'মাসের দু-একটা দিন ও দেরি করে আসে স্কুলে।'

'অ।' স্যার রিন্টুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তা তোর কি এখনো হাসতে ইচ্ছে করছে!'

মাথা উঁচু-নিচু করে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রিন্টু বলল, 'জি স্যার। এভাবে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে নিজেকে গাছের মতো লাগছে, তাই হাসি পাচ্ছে স্যার।'

'আমারও।' পেছনের বেঞ্চ থেকে লুলু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বসে থাকতে থাকতে ওর তো গাছের মতো লাগছে, আর আমার লাগছে স্কুলের শহীদ মিনারের মতো, নো নড়াচড়া, নো চলাফেরা।'

'নিজেকে শহীদ মিনারের সঙ্গে তুলনা করিস, থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব?' স্যার লুলুর দিকে হাত উঁচু করে বললেন।

'তাহলে তো ভালোই হয়।' রিন্টু স্যারের দিকে তাকাল।

স্যারও রিন্টুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'মানে?'

'ওর একটা দাঁতে ব্যথা, ক্লাসে বসেই মুরগির বাচ্চার মতো চিঁ চিঁ করে শব্দ করছিল। তাই থাপ্পড় দিয়ে যদি আপনি ওর ওই দাঁতটা ফেলে দিতেন স্যার তাহলে ওর উপকারই হতো।'

'তাই নাকি রে লুলু, তোর নাকি দাঁতে ব্যথা?'

'জি স্যার।'

'ঠিক আছে, আপাতত বসে থাক। স্কুল পরিদর্শক সাহেব চলে যাবার পর তুই বাসায় চলে যাস।'

'জি স্যার।'

'তা যা বলছিলাম।' স্যার রিন্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর তো এখনো হাসতে ইচ্ছে করছে, না?'

'জি স্যার।'

স্যার বেত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'ঠিক আছে, তুই ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়া।'

রিন্টু ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই স্যার সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রিন্টু এখন হাসবে, তোরা চোখ বড় বড় করে ওর দিকে তাকিয়ে থাক।'

সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের প্রায় সবাই রিন্টুর দিকে ফিরে বড় বড় করে তাকাল। কিছুক্ষণ চলে যায়, রিন্টু আর হাসে না। স্যার হঠাৎ ধমক দিয়ে বললেন, 'কিরে, হাসছিস না কেন?'

মুখটা কাচুমাচু করে রিন্টু বলল, 'এখন হাসি আসছে না স্যার।'

'কেন?'

'সবাই কেমন যেন বানর দেখার মতো তাকিয়ে আছে। এর মাঝে কি হাসা যায়!'

'তাহলে কী করবি?'

'কী করব স্যার?'

পেছন থেকে বাটলু আবার দাঁড়িয়ে বলে, 'স্যার, ওকে তাহলে কাঁদতে বলেন।'

দোদুল ঝট করে বাটলুর দিকে তাকায়। ওর পাওয়ারওয়ালা মোটা চশমার ভেতর দিয়ে ওর চোখ দুটো বিশাল বড় বড় দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে চোখ দুটো বন্দুকের গুলির মতো ছুটে গিয়ে বাটলুর গায়ে গিয়ে লাগবে। বাটলু দোদুলের দিকে তাকাতেই দোদুল ফিসফিস কর বলল, 'আর একটা কথা বলবি তো তোকে সুপার গ্লু দিয়ে গাছের সঙ্গে না, গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালের সঙ্গে ঝোলাব।'

রিন্টুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে স্যার বললেন, 'এই রিন্টু, বাটলু কী বলল, কাঁদবি নাকি?'

'না স্যার, কান্নাও আসছে না।'

'তাহলে যা, সিটে গিয়ে বোস।'

'স্যার, সিটে গিয়ে যদি আবার হাসি আসে!'

'তাহলে এবার এই বেত দিয়ে তোর হাসিটা থামিয়ে দেব।'

স্যার হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সবাইকে ইশারা করে বললেন, 'সবাই একদম চুপ। স্কুল পরিদর্শক সাহেব এসেছেন, লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে উনি এদিকে আসছেন, সবাই চুপ।'

পাথরের মূর্তির মতো আমরা সবাই চুপ হয়ে বসলাম। রিন্টু হঠাৎ ফিক ফিক করে হেসে উঠল শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বড় বড় করে ফেললেন স্যার,

তারপর দ্রুত রিন্টুর দিকে এগিয়ে আসতেই থেমে গেলেন তিনি। হেড স্যার আর স্কুল পরিদর্শক স্যার ক্লাসের ভেতর ঢুকে পড়েছেন গম্ভীর মুখে।

স্কুল পরিদর্শক স্যারকে দেখে আমাদের মন ভালো হয়ে গেল সবার। আমরা ভেবেছিলাম স্কুল পরিদর্শক হবেন বুড়োমতো, বেঁটেমতো কেউ। ইয়া মোটা হবে সে, ভুঁড়িওয়ালা, টাক মাথা, গোঁফ থাকবে তার এবং চেহারা হবে সাত দিন ঘুম না হওয়া মানুষের চেহারার মতো। যাকে দেখলে দেহ থেকে আত্মা ছুটে যেতে চাইবে ভয়ে।

কিন্তু আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। সাদা ধবধবে একটা শার্ট পরেছেন পরিদর্শক স্যার, টাই পরেছেন, সুন্দর প্যান্ট পরেছেন, আয়নার মতো একজোড়া জুতোও পরেছেন। মাথায় চুলগুলো সুন্দর করে আঁচড়ানো, বয়স মোটেই বেশি না, সিনেমার নায়কের মতো লাগছে তাকে।

ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পরিদর্শক স্যার। তার ডান পাশে হেড স্যার দাঁড়িয়ে আছেন, পেছনের দিকে বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে আছেন রশীদ স্যার। সবার দিকে তাকিয়ে পরিদর্শক স্যার মিষ্টি হেসে বললেন, 'শুভ সকাল।'

সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই বলে উঠলাম, 'শুভ সকাল।'

'তোমরা সবাই ভালো আছ তো?' পরিদর্শক স্যার একটু এগিয়ে এসে বললেন।

আমরা সবাই আবার বলে উঠলাম, 'জি স্যার, ভালো আছি।'

পরিদর্শক স্যার বললেন, 'গুড।'

রিন্টু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটু মিথ্যে বলা হয়ে গেছে স্যার। আমরা সবাই ভালো আছি, কিন্তু একজন ভালো নেই।'

'কে ভালো নেই?'

লুলুর দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে রিন্টু বলল, 'লুলু ভালো নেই স্যার।'

পরিদর্শক স্যার লুলুর দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বললেন, 'তুমি ভালো নেই কেন লুলু?'

লুলু চিঁ চিঁ করে বলল, 'আমার দাঁতে ব্যথা স্যার।'

'কেন?'

লুলু কিছু বলার আগেই রিন্টু আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ও প্রতিদিন দাঁত পরিষ্কার করে না তো, সে জন্য।'

'কথাটা কি সত্য লুলু?' পরিদর্শক স্যার লুলুর দিকে হেসে হেসে তাকিয়ে বললেন।

লুলু কোনো কথা বলল না, মাথা নিচু করে ফেলল সে। রিন্টু আবার বলল, 'জি স্যার, কথাটা সত্য।'

'তুমি জানলে কী করে কথাটা সত্য?' পরিদর্শক স্যার রিন্টুর দিকে তাকালেন।

'আমি জানি স্যার।'

'তুমি কি সবজান্তা?'

রিন্টু কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি অনেক কিছুই জানি স্যার।'

'তাই নাকি!' পরিদর্শক স্যার হাসতে হাসতে বললেন, 'বলো তো আমি কেমন?'

'এটা বলা খুব সহজ স্যার। আপনি আমাদের শত্রু, না বন্ধু তা আমি এখনই বলে দিতে পারব।

'পারবে?' কিছুটা উৎসাহী হয়ে পরিদর্শক স্যার একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'বলো তো, আমি তোমাদের শত্রু, না বন্ধু?'

'যদি আপনি আমাদের কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেন তাহলে আপনি আমাদের শত্রু, আর যদি সহজ সহজ প্রশ্ন করেন তাহলে আপনি আমাদের বন্ধু।'

চোখ দুটো বড় বড় করে ফেললেন পরিদর্শক স্যার। কিছুক্ষণ রিন্টুর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি তো দেখি সবজান্তা না, তোমার অনেক বুদ্ধিও আছে, তার মানে তুমি একজন বুদ্ধিজীবীও।'

'তা বলতে পারেন।' রিন্টু খুব স্বাভাবিকভাবে কথাটা বলে দোদুলের দিকে হাত ইশারা করে বলল, 'স্যার, আমাদের মধ্যে আরেক বুদ্ধিজীবী হলো দোদুল, আমরা ওকে ডাকি বুদ্ধিজীবী দোদুল বলে।'

দোদুলের দিকে তাকিয়ে পরিদর্শক স্যার বললেন, 'হ্যাঁ, দোদুলের চশমা পরা দেখে আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। আচ্ছা দোদুল, সবাই যখন তোমাকে বুদ্ধিজীবী দোদুল বলে ডাকে, তখন তোমার কেমন লাগে?'

দোদুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'খারাপ লাগে না স্যার, তখন সত্যি সত্যি নিজেকে বুদ্ধিজীবী মনে হয়।'

বাটলু হঠাৎ প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, ওকে সবাই বুদ্ধিজীবী বলে ডাকলেও, আসলে ওর মাথার ভেতর সব শয়তানি বুদ্ধিতে ভরা।'

'তুমি জানলে কী করে?' পরিদর্শক স্যার বাটলুর দিকে একটু এগিয়ে যেয়ে

বললেন, 'ও তোমার সাথে কোনো শয়তানি করেছে নাকি?'

'শুধু ও না স্যার, ওদের গ্রুপের সবাই?'

'কী করেছিল ওরা?'

বাটলু মুখটা কাচুমাচু করে বলল, 'স্যার, বলতে লজ্জা লাগছে।'

'তা-তা-তাহলে আমি বলি।' রিমন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'একদিন ওর প্যা-প্যা-প্যান্ট...

পরিদর্শক স্যার একটু শব্দ করে বললেন, 'তোমাকে তো বলতে বলা হয়নি, তুমি কি দোদুলদের গ্রুপের?'

'জি স্যার।' রিমনের উত্তর দেওয়ার আগেই বাটলু বলল, 'ও আরেক বুদ্ধিজীবী স্যার, শয়তান বুদ্ধিজীবী।'

'তুমি বোধহয় ওদের প্রতি খুব খেপে আছ।' পরিদর্শক স্যার বাটলুকে বললেন।

মাথা নিচু করে ফেলল বাটলু। তা দেখে পরিদর্শক স্যার কিছুটা শব্দ করে হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমাদের বয়সে আমরাও এ রকম করতাম। একটু বড় হলে এসব আর মনে থাকে না। তখন সবাই বন্ধু হয়ে যায়।' পরিদর্শক স্যার একটু থেমে বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে কথা বলে আমার ভালো লাগছে। এবার আমি তোমাদের কিছু প্রশ্ন করব। আচ্ছা, বলো তো, লবণ বানান কী?'

রিমন দ্রুত হাত তুলে বলল, 'আ-আ-আমি পারব স্যার।'

'বলো।'

'ল ব আর দ-দ-দন্ত্য-ন।

'উঁহু, হলো না।'

'স্যার, ক্যা-ক্যা-কেন হলো না?'

'লবণ লিখতে দন্ত্য-ন না, মূধ্য-ণ লাগে।'

রিন্টু পাশ থেকে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, মূধ্য-ণ না লিখে দন্ত্য-ন লিখলে কি লবণের স্বাদ কমে যায়?'

'না, সেটা যায় না।'

'তাহলে দন্ত্য-ন লেখাই ভালো, অযথা মূধ্য-ণ লিখে কী লাভ?'

'এটা নিয়ম। আচ্ছা এবার আমি আরেকটা প্রশ্ন করি। বলো তো বছরের কোন দিনটি সবচেয়ে বড়?'

লুলু এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'রোজার দিন স্যার।'

'রোজার দিন?'

লুলু একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'জি স্যার। সারা দিন না খেয়ে থাকতে হয় তো, দিন তাই শেষই হতে চায় না, মনে হয় অনেক বড় দিন।'

'আচ্ছা এসব এখন থাক। আমি এবার অন্য ধরনের একটা প্রশ্ন করি। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ আমার মতো স্কুল পরিদর্শক হও, তাহলে কোনো স্কুলে গিয়ে প্রথমেই কী করবে?'

রিন্টু মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'নির্ভয়ে বলব স্যার?'

'হ্যাঁ, নির্ভয়ে বলো।'

'স্কুলে গিয়ে দু-এক ক্লাস ঘুরে আমার আগমন উপলক্ষে সেদিন স্কুলটা ছুটি দিয়ে দেব স্যার।'

হা-হা করে হেসে উঠলেন পরিদর্শক স্যার। তারপর রিন্টুর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতেই বললেন, 'আমিও আজ তোমাদের স্কুলটা ছুটি দেওয়ার জন্য হেডমাস্টার সাহেবকে অনুরোধ করব, যদি তোমরা আমার শেষ প্রশ্নটার সঠিক উত্তর দিতে পার।' স্কুল পরিদর্শক স্যার কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, 'তোমাদের স্কুলে আজ আমি কেন এসেছি, জানো? তোমাদের স্কুলে নতুন একটা বিল্ডিং হবে, সেখানে অনেক কিছু থাকবে, সে বিল্ডিংয়ের জন্য অনেক টাকা দরকার। সরকারের পক্ষ থেকে সে টাকাগুলো দিতে এসেছি আমি। তার আগে একটা অঙ্ক দেব আমি তোমাদের। যদি কেউ এই অঙ্কটা পার, তবেই টাকাগুলো দেব আমি। না পারলে আমাকে নতুন করে ভাবতে হবে— টাকাগুলো দেব কি দেব না।'

বুকের ভেতর ধুক ধুক শুরু হলো সঙ্গে সঙ্গেই। আমি দোদুলের দিকে তাকালাম, দোদুল তাকিয়ে আছে রিন্টুর দিকে। রিমন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'পে-পে-পেটের ভেতর কেমন যেন করে উঠল রে!'

কথাগুলো শুনে ফেলে বাটলুও ফিসফিস করে বলল, 'আমার পেটের ভেতরও।'

রিন্টু আলতো করে বাটলুর মাথায় চাটি মেরে বলল, 'দেখিস, কাপড়-চোপড় আবার নষ্ট করে ফেলিস না।'

সারা ক্লাসরুম নিশ্চুপ, কেউ কোনো কথা বলছে না, এমনকি সামান্য শব্দও হচ্ছে না। পেছন থেকে কে যেন দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। আমরা সবাই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি সামনের দিকে। স্কুল পরিদর্শক স্যার বললেন, 'ওকে, তোমরা রেডি?'

ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তারপর বোর্ডের পাশে রাখা একটা

চক তুলে নিয়ে তিনি কী যেন ভাবলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি কালো বোর্ডের ওপর সাদা চক দিয়ে স্পষ্টভাবে লিখলেন— .০০১ x ১ = ?

ঘুরে দাঁড়ালেন পরিদর্শক স্যার। মুচকি হেসে বললেন, 'এবার তোমাদের মধ্যে কোন ছেলে কিংবা মেয়ে এ অঙ্কটা পারবে?'

ক্লাসের অনেকেই মাথা নিচু করে ফেলল। আমি তাকিয়ে দেখি হেড স্যার ঘামছেন, ঘামছেন রশীদ স্যারও। হেডস্যারের সাদা পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে, রশীদ স্যারের কপালের পাশ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে ঘাম নেমে আসছে নিচের দিকে।

হাসি হাসি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল পরিদর্শক স্যারের। কিছুক্ষণ আগের তিনি, আর এখনকার তিনি— কোনো মিল নেই। তাকে দেখে এখন অনেক অচেনা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে কোনো দিন তাকে দেখিনি আমরা। আর তিনি যে খুব মিষ্টি করে হাসতে পারেন, বিশ্বাস হচ্ছে না এখন এটাও। এখন আর তাকে বন্ধু মনে হচ্ছে না, সত্যি সত্যি তাকে শত্রু মনে হচ্ছে।

পরিদর্শক স্যার গম্ভীর মুখে বললেন, 'কেউ পারবে না?'

ক্লাসরুমটা চুপচাপ হয়ে গেল আরো, যেন এখানে কেউ নেই কিংবা পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে সবাই। আমি আড়চোখে হেডস্যারের দিকে তাকালাম। স্যারের ফরসা মুখটা লাল হয়ে গেছে, রশীদ স্যার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, পরিদর্শক স্যার অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে।

হঠাৎ চট চট শব্দ করে কিছুটা দৌড়ে ক্লাসে ঢুকল নূরুল। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়ে পেছনের খালি বেঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতেই পরিদর্শক স্যার কিছুটা ধমক দিয়ে বললেন, 'এই ছেলে!'

থমকে দাঁড়াল নূরুল এবং চমকে পেছন ফিরে তাকাতেই চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল তার। কিছুক্ষণ সে কিছুই বুঝতে পারল না। স্কুলে যে একজন পরিদর্শক স্যার এসেছেন, সে পরিদর্শক স্যার যে এখন আমাদের ক্লাসে উপস্থিত, তিনি যে জগতের জটিল একটা অঙ্ক দিয়ে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছেন—নূরুল এসবের কিছুই জানে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সে।

পরিদর্শক স্যার আগের চেয়েও গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ক্লাসে ঢুকতে হলে যে ক্লাসটিচারের অনুমতি নিতে হয়, তা তুমি জানো?'

নূরুলের চোখ দুটো যেন অবাক বিস্ময়ে বের হয়ে আসবে। সে একবার হেডস্যারের দিকে তাকায়, একবার পরিদর্শক স্যারের দিকে তাকায়। তারপর প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'জানি স্যার।'

'তাহলে অনুমতি নিলে না কেন?'

'ক্লাসে আসতে দেরি হয়ে গেছে, ভয়ে তাই খেয়াল ছিল না।'

'দেরি হলো কেন?'

'বাবার জন্য ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম।'

'কী হয়েছে তোমার বাবার?'

'কোমরে ব্যথা।'

'কী করে হলো?'

'গাছ থেকে পড়ে গিয়ে।'

ভীষণ আশ্চর্য হয়ে পরিদর্শক স্যার বললেন, 'পড়ে গিয়ে? কী করেন তোমার বাবা?'

'নারকেলগাছের ডাল কাটেন, রসের জন্য শীতের দিনে খেজুরগাছ কাটেন।'

'অ। তা, ব্যথা কি খুব বেশি?

'জি।'

'ওষুধ আনো কোথা থেকে?'

'আমাদের পাশের গ্রামের এক কবিরাজের কাছ থেকে।'

'আচ্ছা যাও, সিটে বসো।'

নূরুল একটু এগিয়ে আসতেই থেমে গেল। পরিদর্শক স্যার আবার ডাকলেন ওকে। নূরুল কাছে যেতেই পরিদর্শক স্যার বললেন, 'ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকাও।'

ব্লাকবোর্ডের দিকে তাকাল নূরুল।

'কী দেখতে পাচ্ছ?'

'একটা গুণ অঙ্ক আছে স্যার।'

'পারবে করতে অঙ্কটা?'

অঙ্কটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল নূরুল। আমাদের বুকের ভেতর কলজেটা লাফাতে শুরু করেছে। পেছনে বসে কে যেন আল্লাহ আল্লাহ করছে আস্তে আস্তে। অনেকে ভয়ে চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করে ফেলেছে। আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল, হাত দুটো একসঙ্গে করে চোখ দুটো আমিও বুজে ফেলেছি। আর সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে মনে মনে আল্লাহকে বলছি—আল্লাহ, তুমি নূরুলকে অঙ্কটা পারার বুদ্ধি দাও, ইংরেজিতে ও কাঁচা, কিন্তু আমাদের ক্লাসে সবচেয়ে ভালো অঙ্ক পারে ও, ওকে অঙ্কটা করার শক্তি দাও আল্লাহ। আল্লাহ, এই আমি কান ধরছি, গপুদের আমগাছের আম আর কখনো চুরি করব না, শিলুদের

পুকুরের মাছ চুপি চুপি আর ছিপ দিয়ে মারব না, চঞ্চলদের টিনের চালে ঢিল দিয়ে আর ভূতের ভয় দেখাব না। আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও। নূরুলকে বুদ্ধি দাও, অঙ্কটা পারার বুদ্ধি দাও আল্লাহ।

চোখ দুটো খুলে আমি সামনের দিকে তাকালাম। নূরুলের মুখটা যেন একটু হেসে উঠল। কিন্তু ভালোভাবে তাকিয়ে দেখি, না, ও হাসছে না। ওর মুখটা গম্ভীর। কিন্তু বেশ একটা ভাব নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল ও। পাশ থেকে একটা চক নিয়ে দ্রুত অঙ্কের সমাধানটা লিখে ফেলল ব্ল্যাকবোর্ডে। তারপর ফিরে এলো আগের জায়গায়।

পরিদর্শক স্যার আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি অঙ্কটা ঠিকভাবে করেছ?'

নূরুলও গম্ভীর মুখে বলল, 'জি স্যার।'

'ভেবে বলো।'

'আমি অঙ্কটা সঠিকভাবে করেছি স্যার।'

সঙ্গে সঙ্গে পরিদর্শক স্যার নূরুলকে জড়িয়ে ধরলেন। সারা মুখ হাসিতে ভরে গেল হেডস্যারের, রশীদ স্যার মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। কিন্তু স্যারের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে, তিনি কাঁদছেন। কাঁদছেন হেড স্যারও, রুমাল দিয়ে ঘন ঘন চোখ মুছছেন তিনি। ক্লাসের সবার মুখ হাসিতে ভরে গেছে। হঠাৎ আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে ঝগড়াটে মেয়ে পলি ডুকরে কেঁদে উঠল। ফ্যালফ্যাল করে ও কাঁদছে আর ওড়না দিয়ে চোখ মুছছে। কাজলের কালি দিয়ে ওর চোখমুখ কালো হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে খেয়াল নেই ওর। আনন্দে ক্লাসের সবাই হাসছে-কাঁদছে।

পরিদর্শক স্যার পকেট থেকে একশ টাকার একটা নোট বের করে নূরুলের হাতে দিয়ে বললেন, 'জীবনে আমি অনেক আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু আজকের মতো এত আনন্দ আমি আর কখনো পাইনি। এ টাকা তোমার, তুমি যা ইচ্ছা তাই কিনে খাবে আজ। আচ্ছা, তোমার কি প্রাইভেট টিউটর আছে?'

নূরুল মাথা এদিক-ওদিক করে বলল, 'না স্যার।'

নূরুলের মাথায় হাত রেখে পরিদর্শক স্যার স্কুলে বিল্ডিং করার ঘোষণা দিলেন এবং হেডস্যারের সঙ্গে পরামর্শ করে চার পিরিয়ড আগেই ছুটি দিয়ে দিলেন স্কুলটা।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম আমরা সবাই। আমি আর রিন্টু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে নূরুলকে কাঁধে নিয়ে ক্লাসের বাইরে চলে এলাম। আমাদের সঙ্গে বের হয়ে এলো ক্লাসের অন্যরাও। এরই মধ্যে স্কুলের সব ক্লাসে খবরটা পৌঁছে গেছে। বের

হয়ে এসেছে সেসব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীও। সারা স্কুলমাঠ ভরে গেছে ছাত্রছাত্রীতে। সবাই নাচছে, চিৎকার করছে। দোদুল, রিমন, বাটলু, পলি, ছন্দা সবাই লাফাচ্ছে ইচ্ছেমতো। লুলুর দাঁতে ব্যথা কোথায় যেন চলে গেছে, ও চিৎকার করে কী একটা গান গাওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু গলা দিয়ে তার কোনো শব্দ বের হচ্ছে না, কেবল মুরগির বাচ্চার মতো চিঁ চিঁ শব্দ হচ্ছে গলা দিয়ে।

হঠাৎ কাঁধের ওপর থেকে নূরুল আমাকে আর রিন্টুকে বলল, 'ওই দেখ, হেডস্যারের রুমের সামনে তাকিয়ে দেখ।'

আমরা হেডস্যারের রুমের বারান্দার দিকে তাকালাম। আমাদের স্কুলের সবগুলো স্যার আর ম্যাডাম দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে, আমাদের মতো তারাও অল্প অল্প হাত-পা নেড়ে নাচছেন। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে—ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর, ভিজে গেছে পাঞ্জাবির সবটুকুই, তবুও বেশ বড়সড় বুড়ি নিয়ে আমাদের হেড স্যারও নাচছেন, মাথা নিচু করে সবার সঙ্গে আপন মনে নাচছেন!

খুব জরুরি একটা মিটিং আছে আজ আমাদের। স্কুলের মাঠে আমরা বসে আছি তাই সেই কখন থেকে। বিকেল শেষ হয়ে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে, কিন্তু মিটিং এখনো শুরু করতে পারছি না। কারণ রিমন এখনো আসেনি।

সাধারণত আমরা পাঁচজন একসঙ্গে না হলে মিটিং শুরু করি না। আজকে বোধহয় রিমনকে বাদ দিয়েই তা শুরু করতে হবে। রিমন এখনো আসছে না দেখে রিন্টু রাগে মুখ লাল করে ফেলেছে, দোদুল একটু পরপর অযথাই ওর চোখের চশমা খুলে শার্টের কোনা দিয়ে পরিষ্কার করছে, নূরুল চুপচাপ মাঠের ঘাসগুলোর দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজছে, আর আমি তাকিয়ে আছি ওদের দিকে। হঠাৎ দপ দপ করে কারো পায়ের শব্দ পেতেই আমরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, রিমন প্রায় দৌড়ে দৌড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু পর কাছে এসে বসেই শব্দ করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগল ও। ওর বুকটা প্রচণ্ড ওঠানামা করছে, ঘামে ভিজে গেছে ওর সারা মুখ।

দোদুল দ্রুত রিমনের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'কী হয়েছে রিমন?'

হাঁপাতে হাঁপাতে রিমন বলল, 'একটা ভ-ভ-ভয়ংকর খবর আছে।'

'কী?' রিন্টু এগিয়ে এসে রিমনের সামনে এসে বসল। ওর চেহারায় এখন আর কোনো রাগ নেই।

'ভূ-ভূ-ভূতের বাড়িতে একটা মা-মা-মানুষ খুন হয়েছে আজ।' চোখ বড় বড় করে রিমন বলল।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল আমাদেরও। রিন্টু একটু শব্দ করে বলল, 'বলিস কি!'

'হ্যাঁ। এই তো এ-এ-একটু আগে পু-পু-পুলিশ এসে লাশটা নিয়ে গেল।'

'তুই দেখেছিস লাশটা?'

'দেখতেই তো গিয়েছিলাম। কি-কি-কিন্তু তার আগেই পুলিশ নিয়ে গেছে লা-লা-লাশটা। এখানে আসতে সে জন্যই তো দেরি হলো।'

'সত্যি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!'

'আচ্ছা খুনটা কে করল?' দোদুল ভয় ভয় মুখে বলল।

'আমি জানি না।'

'ভূতের বাড়িতে খুন, খুনটা তো তাহলে ভূতই করেছে।' আমি দোদুলের দিকে তাকিয়ে বললাম।

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।' নূরুল একটু সোজা হয়ে বসে বলল।

'রাতে ওই বাড়ি থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসে, কখনো কান্নার শব্দ ভেসে আসে। মাঝে মাঝে কাচ ভাঙার শব্দ শোনা যায়, কখনো কাউকে মোমবাতির মতো আলো নিয়ে ঘুরতে দেখা যায় সারা বাড়িতে। সে বাড়িতে একটা খুন হয়েছে সেটা ভূত ছাড়া কেউ করতে পারে না।' আমি আবার বললাম।

'খুন কে হয়েছে জানিস?' রিমনের দিকে তাকাল রিন্টু।

'আমরা তাকে চিনি।'

'কে?'

'ওই যে মো-মো-মোল্লাবাড়ির একটা ছেলে ছিল না, আমাদের মতোই বয়স, সারাক্ষণ খালি গায়ে এখানে ওখানে ঘু-ঘু-ঘুরে বেড়াত। ওই ছেলেটাই নাকি খুন হয়েছে। যারা দেখেছে, তারা তা-ই বলেছে।'

'ছেলেটা তো পাগল ধরনের ছিল।'

'হ্যাঁ।'

'ভূত আর মানুষ পেল না, একটা পাগলকে খুন করল!'

'আ-আ-আমিও সেটাই ভাবছি।'

'এর পেছনে নিশ্চয় বড় কোনো কারণ আছে।' নূরুল খুব গম্ভীর মুখে বলল।

'অবশ্যই।' আমি দোদুলের দিকে তাকিয়ে বললাম।

'আমাদের কাজ বোধহয় একটা বেড়ে গেল।' নূরুল বলল।

'আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে মিটিং হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো আগে শোনা যাক।' দোদুল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দীপ্র, কথাটা তুই বল।'

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে আমি বললাম, 'আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে উত্তরপাড়ার সঙ্গে ক্রিকেট খেলব আমরা, তার প্রস্তুতি নেওয়া এবং ওদের সঙ্গে কথা বলা, দুই. নতুন যে পাখির দুটো বাসা দেখেছি আমরা তার প্রতি খেয়াল রাখা।'

'এবার তিন নম্বর কাজটা হলো, ছেলেটা কেন খুন হলো, তা বের করা।' রিন্টু আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল।

'ভূ-ভূ-ভূত কেন খুন করল, সে-সে-সেটা কি আমাদের জানার দরকার আছে?' রিমন ওর চেহারাটা ভয় ভয় করে বলল।

'আছে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। একটা খুন হলো আর আমরা সেটার তদন্ত করব না, তা কি হয়? আমাদের ফাইভ ডট কমের কাজ তো এটাই।' দোদুল বলল।

'ভূতের ব্যাপার তো!' রিমন মিনমিন করে বলল।

'তাতে কী!'

'যদি তদন্ত করার সময় ভূ-ভূ-ভূত ঘাড়টা মটকে দেয়?' রিমনের চেহারা আরো ভয় ভয় হয়ে গেল।

রিন্টু হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে আমরাও ঘাড় মটকে দেব ভূতের। রাজি?'

একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রিন্টু। আমরা চারজনও লাফিয়ে উঠে ওর হাতের ওপর হাত রেখে বললাম, 'রাজি।'

ক্লাসের ভেতর রশীদ স্যার আর জামান স্যারকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমরা। রশীদ স্যার আমাদের অঙ্ক করান, জামান স্যার পড়ান বিজ্ঞান। এখন তো বিজ্ঞান ক্লাস, তাই ক্লাসে এখন জামান স্যারের আসার কথা। কিন্তু দুই স্যার একসঙ্গে ক্লাসে ঢুকলেন, কোনো সমস্যা হয়নি তো স্কুলে! কিন্তু ভালো করে রশীদ স্যারের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম, না, স্কুলে কোনো সমস্যা হয়নি। কারণ জামান স্যারের সারা মুখে হাসি, রশীদ স্যারও হাসছেন। হাসতে হাসতেই রশীদ স্যার একটু এগিয়ে এসে নূরুলকে বললেন, 'কিরে নূরুল, তুই যে একেবারে নায়ক হয়ে গেলি!'

লজ্জা লজ্জা চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়াল নূরুল। ওর পাশে বসা বাটলুও উঠে দাঁড়াল। বাটলুর চেহারায় শয়তানি হাসি। ও শয়তানের মতো হাসতে হাসতে বলল, 'স্যার, তাহলে তো ওর একজন নায়িকা দরকার।'

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে রশীদ স্যার বললেন, 'হুঁ, তুই তো ঠিকই বলেছিস! নায়ক থাকলেই নায়িকা দরকার হয়। কিন্তু মুশকিল হলো, নায়িকা খুঁজে পাব কোথায়?'

'স্যার, মুশকিল শুধু এটাই না, আরো একটা আছে।' বাটলু বলল।

'কী?' রশীদ স্যার আগ্রহ নিয়ে বাটলুর দিকে তাকালেন।

'নায়িকা খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু নূরুল তো ভূতের মতো কালো, নায়িকা আবার ওকে দেখে ভূত মনে করে অজ্ঞান হয়ে যাবে না তো?' খ্যাক খ্যাক করে শয়তানের মতো হাসতে লাগল বাটলু।

রিন্টু ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, বাটলু বোধহয় কেবল কালো কুচকুচে ভূতই দেখেছে, সাদা ধবধবে ভূতও যে আছে, এটা বোধহয় ও দেখেনি। আপনি যদি বলেন, আমাদের ফাইভ ডট কমের পক্ষ থেকে ওকে একদিন সাদা ভূত দেখাতাম।'

'স্যার!' বাটলু কিছুটা চিৎকার করে বলল, 'আপনি কিছু বলবেন না, ওরা আমাকে ভয় দেখাবে কিন্তু।'

'ও ভুল বলল স্যার। আমাদের একজন বন্ধু কেবল কালো ভূত দেখেই জীবন কাটিয়ে দেবে, ও কোনো দিন সাদা ভূত দেখবে না, তা কি হয়?' রিন্টু দাঁত কিড়মিড় করে আড়চোখে বাটলুর দিকে তাকাল।

'রিন্টু তো ঠিকই বলেছে। দেখবি নাকি সাদা ভূত?'

পেছন থেকে দোদুল বাটলুকে পিঠে খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তুই না করলেও তোর কোনো নিস্তার নেই বাটলু। এত বড় সাহস তোর, তুই ফাইভ ডট কমের সদস্যের সঙ্গে ইয়ার্কি করিস! দাঁড়া অল্প কদিনের মধ্যে তোকে যদি মাথাকাটা ভূতের জঙ্গলের শ্যাওরাগাছের সঙ্গে না ঝুলিয়েছি, তাহলে আমার নাম দোদুল না।'

'ঠিক আছে দেখা যাবে।' বাটলু রাগে কটমট করে একটু শব্দ করেই বলল, 'আগের বার প্যান্টে সুপার গ্লু লাগিয়েছিস কিছু বলিনি, এবার কিছু করলে দেখিস আমি কী করি।'

'তু-তু-তুই কী করবি?' রিমন রাগে ওর শার্টের হাতা গোটাতে লাগল।

'সেটা পরে দেখিস। তোরা মনে করেছিস তোদের পাঁচজনের সাথে আমি পারব না! পরশুদিন অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার ফুফাতো ভাই আসছে। ক্যারাটে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছে সে, দেখিস তাকে দিয়ে তোদের কী প্যাঁদানিটাই না দিই আমি।'

কথাটা শুনে রিন্টু এমন জোরে দাঁত কড়মড় করতে লাগল যে, মনে হলো ও এখনই বাটলুকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে।

'কিরে, তোরা ঝগড়া করছিস নাকি?' রশীদ স্যার আমাদের দিকে একটু এগিয়ে এলেন।

দোদুল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না স্যার, ঝগড়া করব কেন! ভূত কয় প্রকার ও কী কী আমরা তা বুঝাচ্ছিলাম বাটলুকে।

'না স্যার—।' বাটলু কথাটা শেষ করার আগেই স্যার বললেন, 'এখন ভূত-টুত থাক। আমরা অন্য কথা বলি।' রশীদ স্যার নূরুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, তুই কাল যে একশটা টাকা পেলি, তা খরচ করে ফেলেছিস নাকি?'

প্যান্টের পকেট থেকে টাকাটা বের করে নূরুল বলল, 'না স্যার।'

'বলিস কী, এখনো খরচ করিসনি! আমাদের সময় হলে তো এরই মধ্যে দু-এক কেজি মিষ্টি কিনে পেটভরে খেয়ে ফেলতাম

'আমরাও কিছু টাকার মিষ্টি কিনব স্যার, আর কিছু টাকার পাখির খাবার কিনব।'

'অ। তোরা তো আবার পাখির বাসা দেখিস, পাখির ডিম দেখিস, পাখির বাচ্চা দেখিস এবং তাদের আবার খাবারও দিস। ভালো ভালো, তা আর বাকি টাকা দিয়ে কী করবি?'

রিন্টু আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ছাগলের জন্য কিছু খাবার কিনব স্যার।'

'ছাগলের জন্য খাবার! ছাগল পাবি কোথায় তোরা?'

বাটলুর দিকে একবার তাকিয়ে রিন্টু বলল, 'আছে স্যার, আমাদের ক্লাসেও দু-একটা ছাগল আছে!'

'এই চুপ চুপ।' রশীদ স্যার ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হেড স্যার আসছেন এদিকে।'

সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলাম আমরা। একটু পর হেড স্যার পা রাখলেন আমাদের ক্লাসে। স্যারের হাতে বড় বড় তিনটি সুন্দর প্যাকেট। সারা ক্লাসে একদম শব্দ নেই এখন। কিছুটা ভয়ে ভয়ে আমরা তাকিয়ে আছি হেডস্যারের দিকে, ব্যাপারটা খেয়াল করলেন তিনি। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে অপূর্ব এক হাসি দিয়ে বললেন, 'তোমরা এমন ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে আছ কেন আমার দিকে?'

রিন্টু মাথা চুলকাতে চুলকাতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমরা আপনাকে ভয় পাই তো, সে জন্য।'

'কেন ভয় পাও, আমি তোমাদের কখনো মেরেছি কিংবা কখনো বকেছি?'

'জি না স্যার।'

'তাহলে?'

'আসলে স্যার, আপনার কথা মনে হলেই আমাদের বুকের ভেতর কে যেন গুঁতায় আর বলে— ভয় পা, ভয় পা। তাই ভয় পাই।'

হেড স্যার রুবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরাও ভয় পাও নাকি?'

মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়িয়ে মিনমিন করে রুবা বলল, 'জি স্যার। ভয়ে আমাদের হাত-পা কাঁপে।'

'চুলও কাঁপে স্যার।' রুপার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে হেডস্যারের দিকে তাকাল রিন্টু।

'চুল আবার কাঁপে নাকি কখনো?' হেড স্যার রিন্টুকে বললেন।

'জি স্যার। ছেলেদের চুল ছোট তাই কাঁপে না, কিন্তু মেয়েদের চুল বড় তো তাই কাঁপে।'

'তুমি কী করে বুঝলে চুল কাঁপে?'

'ভয়ে যদি চুল খাড়া হতে পারে, তবে কাঁপতে পারবে না কেন স্যার!'

'যুক্তি তো ভালোই দিয়েছ।' হেড স্যার রিন্টুর দিক থেকে নূরুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবা নূরুল, একটু এদিকে আয় তো বাপ।'

নূরুল কিছুটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল স্যারের দিকে। নূরুল কাছে যেতেই স্যার একটা প্যাকেট খুলে ফেলে নীল রঙের একটা শার্ট বের করে নূরুলের হাতে দিয়ে বললেন, 'বাবা নূরুল, কাল সারা রাত একদম ঘুম হয়নি রে বাপ। সারা রাত আনন্দে কেঁদেছি। বুড়ো হয়েছি তো, শুধু শুধু চোখে পানি আসে। কত চেষ্টা করার পর স্কুলে একটা বিল্ডিং করার অনুমতি পেলাম, কিন্তু শর্ত একটাই ছিল, পরিদর্শক সাহেব পরীক্ষা করবেন স্কুলের ছাত্রদের। আমরা সে পরীক্ষায় পাস করেছি রে বাপ, শুধু তোর জন্য পাস করেছি। তোর জন্য আমি একটা শার্ট, একটা প্যান্ট, একটা গেঞ্জি আর একটা কালো বেল্টের ঘড়ি এনেছি। খুব ভালো বেসে তোকে এসব দিচ্ছি রে। তুই তো আমার ছেলে, না! একজন বাবা হয়ে ছেলেকে জিনিসগুলো দিচ্ছি। তুই প্রতিদিন এসব গায়ে দিয়ে স্কুলে আসবি। জীবনের শেষ বয়সে স্কুলের বিল্ডিংটা করে যাওয়া দেখে আর তোর দিকে তাকিয়ে আমি প্রতিদিন আনন্দে কাঁদব।' ঝরঝর করে কাঁদতে লাগলেন হেড স্যার। সঙ্গে সঙ্গে নাক টেনে টেনে কাঁদতে লাগল রুবা, ছন্দা, পলিও। পানি এসে গেছে আমাদের চোখেও।

হেড স্যারের হাত থেকে প্যাকেটগুলো নিয়ে নূরুল তার সিটের দিকে এগিয়ে আসছে। প্যাকেট থেকে খোলা শার্টটা মেঝের সঙ্গে লাগছিল। তাই দেখে পলি কিছুটা ধমক দিয়ে বলল, 'এই নূরুল, দেখছিস না, তোর শার্টটাতে ময়লা লাগছে, দে তো ভাঁজ করে দিই!'

অবাক হয়ে গেলাম আমরা। ক'দিন আগেও পলি আমাদের পাঁচজনের কাউকে দেখতে পারত না, কথা বলত না, এমনকি আমাদের দিকে তাকাতও না। সেই পলি মায়ের মতো যত্ন করে নূরুলের শার্ট ভাঁজ করে প্যাকেটে ভরে দিচ্ছে! রিমন আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'দে-দে-দেখেছিস, পলি বোধহয় নূ-নূ-নূরুলকে পছন্দ করে ফেলেছে, হা-হা-হা।'

'চুপ।' আমি হাত দিয়ে রিমনের মুখটা চেপে ধরলাম।

নূরুল এসে ওর সিটে বসতেই হেড স্যার আরো বেশি হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমাদের জন্য একটা সুখবর আছে। ক'বছর ধরে তো স্কুলে কোনো পিকনিক হয় না, এবার একটা পিকনিক হবে স্কুলে। আর পিকনিকের জন্য আমি স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদের দশ হাজার টাকা প্রদান করলাম।'

হেডস্যারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিন্টু লাফ দিয়ে বেঞ্চে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'আমার স্যার, তোমার স্যার... ।'

সঙ্গে সঙ্গে আমরা চারজন বলে উঠলাম, 'হেড স্যার, হেড স্যার ।'

হেড স্যার কিছুটা রাগী রাগী চেহারা করতে গিয়ে হেসে ফেলে বললেন, 'এই পাগল, কী করছিস!'

স্যারের দিকে তাকিয়ে রিন্টু শক্ত হয়ে বলল, 'স্যার, আপনি আমাকে মেরে লম্বা করে ফেলুন আজ, চার-পাঁচটা বেত ভাঙুন আমার পিঠে, তবু আমি আজ এটা করবই । সবাই বলো--আমার স্যার, তোমার স্যার...

ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'হেড স্যার, হেড স্যার...

টিফিন পিরিয়ডে স্কুলের জামতলায় বসে আছি আমরা। ক্লাস টেনের সোহেল ভাইয়া, ক্লাস নাইনের টগর ভাইয়া এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমরা কি পিকনিকের ব্যাপারে কিছু ভেবেছ?'

দোদুল বলল, 'না তো ভাইয়া!'

সোহেল ভাইয়া বললেন, 'দশ হাজার টাকা দিয়ে তো স্কুলের সব ছাত্রছাত্রীর পিকনিক হবে না।'

'তাহলে?' দোদুল বলল।

'প্রত্যেককে কিছু না কিছু চাঁদা দিতে হবে।'

'কত করে দিতে হবে ভাইয়া?' রিন্টু বলল।

'এখনো ঠিক হয়নি। কালকে এই সময়ে অর্থাৎ টিফিন পিরিয়ডে চলো আমরা সবাই বসে আলোচনা করে ঠিক করি।'

'তা-ই ভালো হয় ভাইয়া। বাজেট করে কত টাকা চাঁদা দিতে হবে তা কালকেই ঠিক করলে ভালো হয়।' সোহেল ভাইয়াকে বলল দোদুল।

'ঠিক আছে, কালকেই কথা হবে।' সোহেল ভাইয়া যাওয়ার সময় নূরুলের মাথার চুলগুলো বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ নূরুল।'

নূরুল হেসে বলল, 'ওয়েলকাম ভাইয়া।'

সোহেল ভাইয়া আর টগর ভাইয়া চলে যেতেই দোদুল বলল, 'কাজ তো আরেকটা বেড়ে গেল।'

'হ্যাঁ।'

রিন্টু সোজা হয়ে বসে বলল, 'যত কাজই বাড়ুক, আজ রাতে আমরা ভূতের বাড়ি দেখতে যাব।'

'আজকেই!' আমি বললাম।

'হ্যাঁ!'

'দু-দু-দু-এক দিন পরে গেলে হয় না?' রিমন ভয় ভয় গলায় বলল।

'না। আজ রাতেই যাব।'

দোদুল রিন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমারও আজকেই যেতে ইচ্ছে করছে।'

নূরুল বলল, 'আমারও।'

রিন্টু আমাকে বলল, 'কিরে দীপ্র, তুই যাবি না?'

'যাব তো।'

'তাহলে কথা বলছিস না কেন?' রিন্টু কিছুটা রেগে বলল।

'ভাবছি।'

'কী ভাবছিস?'

'মাঝে মাঝে ও এমন চুপচাপ হয়ে যায় যে কথাই বলে না, মনে হয় বোবা।' দোদুল আমার দিকে তাকিয়ে হেসে হেসে বলল।

রিন্টু গম্ভীর গলায় বলল, 'তাহলে আমরা চারজন যাচ্ছি।'

'চারজন যাচ্ছি মানে?' আমি বললাম।

রিন্টু বলল, 'রিমন যাচ্ছে না আজ।'

'যাব না মা-মা-মানে!' প্রচণ্ড রেগে গেল রিমন।

'তুই না ভয় পাচ্ছিস?'

'আমি ভ-ভ-ভয় পাচ্ছি?'

'তাই তো মনে হলো।'

'ব-ব-বললেই হলো।'

'ঠিক আছে, তুই ভয় পাস নি, রাগছিস কেন?'

'কই রাগলাম!'

রিন্টু এদিক-ওদিক চোখ ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যি তো, রাগ কই গেল!'

রিমন আরো রেগে বলল, 'আ-আ-আমি কিন্তু তোর মা-মা-মাথা ফাটিয়ে দেব।'

'মাথা ফাটাবি?'

'হ্যাঁ।'

'কী দিয়ে ফাটাবি?'

'বাঁশ দিয়ে।'

'বাঁশ তো এখানে নেই, আমি কি একটা এনে দেব?'

'তুই কিন্তু আমাকে আ-আ-আরো রাগিয়ে দিচ্ছিস।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা পাঁচজনই যাচ্ছি আজ।' রিমনের মাথায় আস্তে করে চাটি মেরে বলল রিন্টু।

'কিন্তু তার আগে উত্তরপাড়ার সাথে ক্রিকেট খেলা নিয়ে কথা বলতে হবে বিকেলে।' দোদুল সবার দিকে তাকিয়ে বলল।

'হ্যাঁ।' নূরুল বলল।

'বিকেলেই কিন্তু কাজটা করতে হবে।'

'কিন্তু রাতে যে আমরা ভূতের বাড়ি দেখতে যাব, তার তো কোনো পরিকল্পনা হলো না।' আমি বললাম।

'পরিকল্পনাটা বিকেলে করলে হয় না!' রিন্টু আমার দিকে তাকিয়ে বলল।

আমি বললাম, 'না, এখনই ফাইনাল করা উচিত।'

'একটা জায়গায় আমরা জড়ো হব আগে।' রিন্টুর দিকে তাকিয়ে বলল দোদুল।

রিন্টু বলল, 'রাত কয়টায়?'

নূরুল বলল, 'ঠিক সাড়ে বারোটায়।'

'কোন জায়গায় আমরা জড়ো হব?'

নূরুল সবার দিকে তাকাল। আমার দিকে তাকাতেই বললাম, 'রিমনদের বাসার সামনে যে খালি মাঠটা আছে, সেখানে জড়ো হলে কেমন হয়?'

'খু-খু-খুব ভালো হয়।' রিমন খুশি খুশি চেহারা করে বলল।

'নিজের বাসার সামনে তো, ভালো তো হয়ই।' রিমনের দিকে তাকিয়ে রিন্টু বলল, 'কিন্তু তোকে একটা কাজ করতে হবে এর জন্য।'

রিমন বলল, 'কী-কী-কী?'

'তুই সবচেয়ে আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি মাঠে।'

'আমি আগে ক্যা-ক্যা-কেন?'

'তোর বাসার সামনে যে!'

দোদুল হাত দিয়ে ইশারা করে রিন্টুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না না, কেউ আগে গিয়ে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকবে না। সবাই যার যার বাসার দূরত্ব অনুযায়ী বাসা থেকে বের হবে, যেন ঠিক সাড়ে বারোটায় মাঠে সবাই একসঙ্গে পৌঁছতে পারি।'

'সেটাই ভালো।' নূরুল উঠে দাঁড়াল, 'চল ক্লাসে যাই, এখনই ক্লাস শুরু হবে।'

সবাই উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম আমরা। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি কিছুটা দূর দিয়ে বাটলু হেঁটে যাচ্ছে। বাটলু কি-আমাদের পরিকল্পনার কথা শুনে ফেলেছে? শুনে থাকলে সর্বনাশ। সে এ পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেবে। শেষে ভূতের বাড়ির ভূতরাও জেনে যাবে আমাদের এ গোপন পরিকল্পনার কথা।

তখন কী হবে? ভূতরা কি আমাদের আক্রমণ করে বসবে?

সবার দিকে তাকালাম আমি। দোদুলের চোখ দুটো চশমার ভেতর দিয়ে আরো বড় বড় দেখাচ্ছে, রিন্টুর মুখ লাল হয়ে গেছে, নূরুল আগের মতোই স্বাভাবিক। কিন্তু রিমনের চেহারাটা ধবধবে সাদা হয়ে গেছে একেবারে, যেন ও একটি টিকটিকি, গায়ে কোনো রক্ত নেই ওর।

বিকেলবেলায় উত্তরপাড়ায় গিয়েছিলাম আমরা। যদিও সবকিছু আগেই বলা হয়েছিল, আজ গিয়েছিলাম শুধু দেখা করার জন্য। আমাদের দেখে ওরা এত খুশি হলো যে, ওদের ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন রাশেদ তো আমাদেরকে ওদের বাসায় নিয়ে গিয়ে দুটো করে মিষ্টি খাওয়াল। আমাদের পাঁচজনেরই মন ভালো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

খেলা শুরু হবে কাল বিকেলে। আম্পায়ার থাকবেন দুজন—একজন আমাদের পক্ষ থেকে, আরেকজন ওদের পক্ষ থেকে। বিরতির আগে একজন খেলা পরিচালনা করবেন, আরেকজন করবেন বিরতির পরে। মাঠ আমাদেরটাও ব্যবহার করব না, ওদেরটাও না। পূর্ব পাড়ায় বড় যে মাঠটা আছে, আমাদের খেলা হবে সেখানে। পূর্ব পাড়ার ছেলেরা খুশি হয়ে স্বীকার হয়েছে। অবশ্য এর আগে ওরা অন্য এক দলের সঙ্গে খেলার জন্য আমাদের মাঠটা ব্যবহার করেছিল।

ওদের ক্যাপ্টেন রাশেদ নতুন একটা প্রস্তাব দিয়েছে আজ। যে দল জিতবে তাকে তো একটা পুরস্কার দেওয়া দরকার, কিন্তু আমাদের দুদলের তো তেমন কোনো টাকা-পয়সা নেই, তাহলে কী করব আমরা? অনেক কথা বলার পর শেষে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে— যে দল জিতবে সে দলকে পরাজিত দল তাদের সবচেয়ে ভালো একটা ব্যাট ও ভালো একটা বল এক মাসের জন্য দিয়ে দেবে। বিজয়ী দল এক মাস ওগুলো ব্যবহার করে খেলবে, তারপর ফেরত দেবে।

খুবই ভালো প্রস্তাব। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেছি আমরা। রিন্টু অবশ্য একবার বলেছিল, ব্যাট ও বলটা একেবারে দিয়ে দেওয়া হবে বিজয়ী দলকে। কিন্তু মুশকিল হলো—একটা ব্যাট ও বল বিজয়ী দলকে একেবারে দিয়ে দিলে পরাজিত দলকে ভবিষ্যতে আবার খেলতে হলে নতুন করে ব্যাট ও বল কিনতে হবে। কারণ দু দলেরই মাত্র দুটো করে ব্যাট ও বল আছে। তাই দু দলই একসঙ্গে সে প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে।

স্কুলের কাছে এসেই নূরুল বলল, 'আজ আর বাইরে থাকব না।'

আমি বললাম, 'কেন?'

'কাল ক্লাসে পড়া আছে না, পড়াটা কমপ্লিট করে তারপর রাতে আবার বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস।' দোদুল সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাত কটায় আসতে হবে সবার মনে আছে তো এটা?'

আমরা সবাই মাথা কাত করে বললাম, 'হ্যাঁ, মনে আছে।'

চোখে একটুও ঘুম নেই আমার। অথচ রাত বারোটা বেজে গেছে। অন্য দিন হলে এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়তাম, কিন্তু ঘুম আসছে না মোটেই। আর মাত্র পনের মিনিট পর ঘর থেকে বের হব। তারপর আরো পনের মিনিটে রিমনদের বাসার সামনে পৌঁছে যাব।

এখনো ঘুমাচ্ছি না কেন, এখনো কেন লাইট জ্বালিয়ে রেখেছি, শরীর খারাপ করেছে কি না—মা কিছুক্ষণ আগেও বারবার এমন জিজ্ঞাসা করছিল। আমি কিছু বলিনি। এটা-ওটা বলে কাটিয়ে দিয়েছি। তারপর লাইট নিভিয়ে ঘুমিয়ে পরার ভান করেছি।

আমার হাতঘড়িটার একটা বোতাম টিপলে অল্প আলো হয় ঘড়িতে। ঘড়ির বোতামটা টিপে দেখি বারোটা বেজে দশ মিনিট। খাট থেমে নেমে আমি জুতোজোড়া পরে নিলাম, তারপর প্রয়োজনীয় আর সব জিনিস নিয়ে দরজার ছিটকিনিটা খুলে বের হয়ে এলাম চুপচাপ। বাইরে থেকে দরজাটা আটকিয়ে বাসার পেছনের দেয়ালে উঠলাম। যতটুকু সম্ভব শব্দ না করে লাফ দিলাম বাসার বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল আমার। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, একটুও আলো নেই কোথাও।

কিছুক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, তারপর পা টিপে টিপে রওনা দিলাম রিমনদের বাসার দিকে।

রিমনদের বাসার কাছাকাছি এসে সামনের মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখি ওরা চারজন এসে গেছে। এই অন্ধকারের মাঝেও দেখতে পেলাম ওরা কী নিয়ে যেন হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। আমাকে দেখেই নূরুল একটু এগিয়ে এসে বলল, 'দেরি করলি যে?'

'ঘুটঘুটে অন্ধকার।'

রিন্টু একটু রেগে বলল, 'আমরা বুঝি আসিনি!'

'আমি স্যরি।'

'ওকে।' দোদুল আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল, রওনা দেওয়া যাক।'

কিছুদূর যাওয়ার পর গোরস্থানের রাস্তায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিমন কেমন যেন চিঁউ চিঁউ করে উঠল। রিন্টু সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিস করে বলল, 'রিমন, এমন করলি কেন?'

'এ-এ-এমনি।'

'ভয় পেয়েছিস?'

'ন্-ন্-না।'

'তাহলে এমন করছিস কেন?'

'আর করব না।'

আমি রিমনের পাশে গিয়ে ওর হাতটা ধরলাম। রিমন কেমন যেন অল্প অল্প কাঁপছে। আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই, আমি আছি তোর পাশে।'

গোরস্থানের কাছাকাছি এসেই আমরা পাঁচজন প্রায় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটতে লাগলাম। এর মধ্যে রিমন আবার চিঁউ চিঁউ করে উঠল। রিন্টু এবার রাগ করে বলল, আরেকবার এমন শব্দ করেছিস তো তোকে বাসায় রেখে আসব আমরা।

রিমন আস্তে করে বলল, 'স্যরি।' কিন্তু আমার কাছে মনে হলো ও আবার চিঁউ চিঁউ করে উঠল।

গোরস্থান পার হয়ে বাঁ দিকে যে মাটির রাস্তা গেছে, আমরা সেদিকে পা বাড়ালাম। সামনে বিরাট একটা বটগাছ। গাছটার কাছে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকটা বাদুড় শব্দ করে উড়ে গেল। আমরা পাঁচজনই সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালাম। আমরা এবার পাঁচজনই ভয় পেয়েছি।

বটগাছ পার হয়ে সামনের দিকে তাকালেই ভূতের বাড়িটা দেখা যায়। আমরা বটগাছ পার হয়ে সামনের দিকে তাকালাম। কিন্তু ভূতের বাড়ির ছায়াটাও দেখতে পেলাম না সেদিকে। আরো একটু এগিয়ে গেলাম আমরা। হঠাৎ একটা শেয়াল দৌড়ে গেল আমাদের সামনে দিয়ে। কিছুদূর গিয়ে শেয়ালটা দাঁড়িয়ে পড়ে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। দোদুল মাটি থেকে একটা কী যেন তুলে ঢিল মারল শিয়ালটাকে, দৌড়ে পালিয়ে গেল সে পাশের জঙ্গলে।

আমরা আরো একটু এগিয়ে গেলাম। আমাদের কাছ থেকে ভূতের বাড়িটা এখন মাত্র বিশ-পঁচিশ হাত দূরে। হঠাৎ দোদুল দুহাতে দুদিক দিয়ে আমাদের

সামনে যেতে বাধা দিল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'সামনের দিকে তাকা সবাই।'

আমরা সামনের দিকে তাকিয়েই চোখগুলো বড় বড় করে ফেললাম। দুটো মোমবাতির মতো আলো একবার এদিক যাচ্ছে, আরেকবার ওদিক। আলোগুলোর পেছনে কে যেন হেঁটে যাচ্ছে ছায়ার মতো। কিছুক্ষণ এভাবে হাঁটার পর আর দেখা গেল না আলোগুলো।

চুপচাপ আমরা পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছি। দিনের বেলা এ বাড়িটাকে খুব সাধারণ একটা বাড়ি মনে হয়। দেড়শ বছর আগে এক জমিদার এ বাড়িটা তৈরি করেছিলেন, এখন আর এখানে কেউ থাকে না। কিন্তু রাত হলেই কেমন যেন হয়ে যায় বাড়িটা। অন্ধকার সে বাড়ি থেকে হাসির শব্দ আসে, কখনো কান্নার শব্দ আসে, কখনো ভারী কিছু পড়ার শব্দ শোনা যায়, কখনো শোনা যায় কাচ ভাঙার শব্দ।

নূরুল হঠাৎ ইশারা করে সবাইকে আকাশের দিকে তাকাতে বলে ফিসফিস করে বলল, 'আজ তো বোধহয় অমাবস্যা।'

রিমন বলল, 'তাই নাকি!'

দোদুল আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, চাঁদ দেখছি না তো আকাশে।'

'তাই তো বলি, এত অন্ধকার কেন আজ রাতে?' রিন্টু গলা চেপে কথাটা বলল।

'অ-অ-অমাবস্যার রাতে নাকি ভূতরা আ-আ-আনন্দ করে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'সেদিন ওদের খেপালে ওরা মানুষের ক্ষ-ক্ষ-ক্ষতি করে ভীষণ।'

নূরুল বলল, 'তা-ই তো শুনেছি।'

'চল, আজ তাহলে ভূতের বাড়ি দেখে কাজ নেই।'

'তাহলে?' রিন্টু বলল।

'অ-অ-অন্যদিন আসব আমরা।' রিমন আমার হাতটা আরো জোরে চেপে ধরে বলল।

দোদুল বলল, 'রিমন খারাপ বলেনি।'

'চল, আজকে তাহলে ফিরেই যাই।' নূরুল বলল।

'যাবি?' রিন্টু বলল।

দোদুল বলল, 'আরেক দিন তো আসবই আমরা।'

রিন্টু অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, 'তোরা যখন বলছিস, তাহলে চল, সবাই চলে যাই, আরেক দিন আসব।'

আমরা ফিরে আসতে লাগলাম পা টিপে টিপে। কিন্তু গোরস্থানের কাছে এসে হঠাৎ চমকে উঠলাম আমরা। খস খস শব্দ করে কে যেন পেছন পেছন আসছে আমাদের। ঝট করে আমরা পাঁচজনই একসঙ্গে পেছন ফিরে তাকালাম এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম মানুষের মতো লম্বা কী যেন একটা দ্রুত সরে গেল গোরস্থানের বাঁ দিকের দেয়ালের পাশে।

স্কুলে আসার সঙ্গে সঙ্গে পিয়ন চাচা দৌড়ে এসে বললেন, 'বড় স্যার আপনাদের ডাকছেন।'

রিমন সঙ্গে সঙ্গে ভয় ভয় চোখে বলল, 'ক্যা-ক্যা-কেন?'

'তা তো জানি না। কিন্তু বড় স্যার অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের খুঁজছেন।'

'হেড স্যার কি রেগে আছেন?' দোদুল পিয়ন চাচার দিকে তাকিয়ে বলল।

'না, রাগ তো দেখলাম না।'

'আমরা কি কোনো অন্যায় করেছি?' রিন্টু পিয়ন চাচার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল।

'সে রকম তো কোনো কিছু শুনি নাই।'

'তাহলে?' নূরুল খুব চিন্তিত মুখে বলল।

'আপনারা কি আসলেই কোনো অন্যায় করছেন?' পিয়ন চাচা আমাদের সবার দিকে একবার করে তাকালেন।

আমি বললাম, 'না।'

'কোনো খারাপ কাজ করছেন?'

'না তো!' রিন্টু বলল।

'তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন? তাড়াতাড়ি গিয়ে বড় স্যারের সঙ্গে দেখা করেন।' পিয়ন চাচা কথাটা বলে হেডস্যারের রুমের দিকে চলে গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। হেড স্যার আমাদের কেন ডাকলেন, কোনো কিছুই বুঝতে পারছি না আমরা।

রিন্টু হঠাৎ বলল, 'কাল রাতের ঘটনা হেড স্যার জেনে ফেলেন নি তো?'

দোদুল একটু এগিয়ে এসে বলল, 'কীভাবে জানবেন?'

'যদি বাটলু বলে দেয়?'

'বাটুলও কি জানে আমরা রাতে ভূতের বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম?' রিন্টুর দিকে তাকাল নূরুল।

'জানতেও তো পারে। গতকাল স্কুলে কথা বলার সময় আমাদের পাশ দিয়ে

ওকে যেতে দেখেছি।' রিন্টু বলল।

'তা ছাড়া কাল রাতে মানুষের মতো লম্বা যে একজনকে গোরস্থানের দেয়ালের পাশে সরে যেতে দেখলাম, সে-ইবা কে ছিল?' নূরুল আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল।

'যদি বাটলু হেড স্যারকে কিছু বলে, তাহলে আজকেই ওকে গাছের সঙ্গে সুপার গ্লু দিয়ে ঝোলাব।' রিন্টু রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

সালাম দিয়ে হেড স্যারের রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে স্যার হেসে হেসে বললেন, 'তোমরা একটা কথা আমার কাছে গোপন করেছ কেন?'

বুকের ভেতর ধক করে উঠল আমাদের। রিন্টুর দিকে তাকিয়ে দেখি ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, চশমার ভেতর দিয়ে দোদুলের চোখ দুটো আরো বড় বড় দেখাচ্ছে, নূরুল মাথা নিচু করে ফেলেছে, আর রিমনকে দেখে মনে হচ্ছে ও এখন কেঁদে ফেলবে।

'কথা বলছ না কেন তোমরা?'

হেড স্যারের দিকে একবার তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে ফেললাম আমি। স্যার কি তাহলে গত রাতের ঘটনা জানেন? বাটলু হারামজাদা তাহলে সত্যি সত্যি বলে দিয়েছে স্যারকে? মনে মনে বললাম, দাঁড়া হারামজাদা বাটলু, আজকে বিকেলে তোকে গাছের সঙ্গে তো ঝোলাবই, সঙ্গে সারা গায়ে লাল পিঁপড়া ছেড়ে দেব। দেখি তোকে আজ কে বাঁচায়।

'তোমরা কি বোবা হয়ে গেলে নাকি?' হেড স্যার বেশ জোরে হেসে হেসে বললেন।

'স্যার, আমরা আপনার কথা বুঝতে পারছি না।' দোদুল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল।

'আমি কি ইংরেজি বলেছি, না আরবি বলেছি!'

'আমরা তো আপনার কাছে কোনো কিছু গোপন করিনি।' রিন্টু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

'গোপন করোনি, না? বিকেলে তোমরা কী করবে আজ? উত্তর পাড়ার সঙ্গে ক্রিকেট খেলবে না?'

বুক থেকে বিরাট একটা পাথর নেমে গেল আমাদের। রিন্টু হাসি হাসি মুখ করে বলল, 'আপনি জানলেন কী করে স্যার?'

'গতকাল উত্তর পাড়ায় একটা কাজে গিয়েছিলাম, তখন শুনতে পেয়েছি।'

'কথাটা আমরা আজকে আপনাকে জানাতাম স্যার।'

'ঠিক আছে। কিন্তু তার আগে আরেকটা কাজ করতে হবে যে।'

'কী কাজ স্যার।'

'পিকনিকের ব্যাপারে ফাইনাল সিদ্ধান্তটা নিতে হবে।'

'জি স্যার।'

ক্লাস টেনের সোহেল ভাইয়া, ক্লাস নাইটের টগর ভাইয়া, ক্লাস এইটের পিন্টু ভাইয়া আর ক্লাস সেভেনের সুমন ভাইয়া হেড স্যারের রুমে ঢুকলেন। ওদের দেখে স্যার বললেন, 'তোমরা সবাই যেহেতু এসে গেছ, তাই সিদ্ধান্তের কথাটা এখনই শুরু করা যাক। সোহেল, তুমি কী ভেবেছে, সেটা আগে বলো?'

সোহেল ভাইয়া একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'স্যার, স্কুল থেকে আমরা যে টাকাগুলো পেয়েছি, তার সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে ৫০ টাকা করে চাঁদা দেব। তাহলে সুন্দরভাবে পিকনিকটা করা যাবে।'

'গুড। তা পিকনিকটা করবে কোথায়?'

'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবার আমরা আমাদের স্কুলেই পিকনিকটা করব।'

'গুড। তাতে যাওয়া-আসা, স্পটের ভাড়া ইত্যাদি বেঁচে যাবে।' হেড স্যার আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী, তোমরা রাজি তো?'

আমরা সবাই বললাম, 'হ্যাঁ।'

রশীদ স্যার হেড স্যারের রুমে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আমাকে ডেকেছেন স্যার!'

'হ্যাঁ রশীদ সাহেব, বসুন। এবারে যে পিকনিকটা হবে, তার মূল দায়িত্বে থাকবেন আপনি। সোহেল, টগর, পিন্টু, সুমন তো রয়েছেই, সঙ্গে ওরা পাঁচজনও রয়েছে। চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে সব কাজ ওরাই করবে। আপনি শুধু দেখবেন আরকি।'

'অসুবিধা হবে না স্যার, যে ক'জনকে দেখছি এখানে, ওরা বেশ ভালোভাবে কাজটা করতে পারবে আশা রাখি।'

'আরেকটা কথা।' হেড স্যার আমাদের দিকে তাকিয়ে রশীদ স্যারের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'ওরা তো একটা ক্রিকেট খেলার প্রতিযোগিতা দিয়েছে আজ। বিকেলেই খেলা, আপনি ওদের পাঁচজনকে ছুটি দিয়ে দিন। ওদের আজ ক্লাস করতে হবে না। বাসায় গিয়ে রেস্ট নিয়ে খেলতে যাক ওরা।'

রিমন খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'থ্যা-থ্যা-থ্যাঙ্ক স্যার।'

হেড স্যারের রুম থেকে সবাই বের হয়ে আসছি, ঠিক তখনই আমাদের পাঁচজনকে আবার ডাকলেন তিনি। আমরা স্যারের কাছাকাছি যেতেই স্যার তার

ড্রয়ার থেকে তিন প্যাকেট চুইংগাম বের করে বললেন, 'খেলার সময় নাকি চুইংগাম চিবোতে হয়। এগুলো তোমাদের জন্য।'

আমরা অবাক চোখে হেড স্যারের দিকে তাকালাম। আমাদের বাবার মতো হেড স্যার, বাবার মতো ভালোবাসেন তিনি আমাদের।

মাঠে দু দলের খেলোয়াড়রা নেমে গেছে। দুজন আম্পায়ারও এসেছেন। চারদিকে হৈ-হুল্লোড়ের শব্দ। দু পাড়ার প্রায় সব ছেলেমেয়েই মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছে। দু পাড়ার বেশ কয়েকজন বড় মানুষও এসেছেন। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো, আমাদের পাড়ার মসজিদে আজান দেন যে মানুষটি তিনিও এসেছেন। রিমন আমাকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে তার কাছে গিয়ে বলল, 'হুজুর, দোয়া কইরেন।'

মুয়াজ্জিন হুজুর আমাদের মাথায় হাত দিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলে ফুঁ দিলেন, তারপর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'বিসমিল্লাহ বলে খেলা শুরু করিও।'

মাঠের ভেতর টস হচ্ছে, দৌড়ে আমরা সেখানে গেলাম। একজন আম্পায়ার একটা পয়সা ওপরে তুলে ছুড়ে মারলেন। পয়সাটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপুড় হয়ে দেখলাম পয়সাটাকে। টসে উত্তর পাড়ার দল জিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরা জানিয়ে দিল প্রথমে ওরা বল করবে।

রিন্টু আর নূরুল ব্যাট হাতে মাঠে দাঁড়িয়ে রইল, আমরা বের হয়ে এলাম মাঠ থেকে। রিন্টু আমাদের প্রথম ব্যাটসম্যান, ও তাই ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে স্টাম্পের সামনে দাঁড়াল। ওদের দলের একজন বল হাতে এগিয়ে আসছে, খুব দ্রুত সে দৌড়ে আসছে বল করার জন্য এবং শেষে বলটা ছুড়ে দিল রিন্টুর দিকে। রিন্টু কিছু করতে পারল না, আস্তে করে টোকা দিয়ে বলটাকে পাশ দিয়ে ঠেলে দিল, কোনো রান হলো না।

আবার বল করতে আসছে ছেলেটি। এবার আরো জোরে বলটি ছুড়ে দিল সে। রিন্টুর ব্যাট এবার বলটা স্পর্শই করতে পারল না। বল সোজা চলে গেল উইকেটকিপারের হাতে।

তৃতীয়বারের মতো বল নিয়ে ছুটে আসছে ছেলেটি। রিন্টু এবার যেন একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। একদৃষ্টিতে ও তাকিয়ে আছে ছেলেটির দিকে। ছেলেটি বল ছুড়ে দিল, রিন্টু সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট চালাল, তারপর সবাইকে ফাঁকি দিয়ে বলটা চলে গেল মাঠের বাইরে।

৪৭ ওভার খেলার পর আমাদের সবাই আউট হয়ে গেল। আমরা মোট রান করেছি ১২৩। সবচেয়ে বেশি রান করেছে রিমন। ও করেছে ২৬ রান।

আধাঘন্টা পর আমরা বল করার জন্য প্রস্তুতি নিলাম। আমাদের সবচেয়ে ভালো বোলার হলো দোদুল, তারপরে নূরুল। দোদুল তার বল করার জন্য মাঠে একপাশে চলে গেল, আমরা যার যার মতো ফিল্ডিং করার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমাদের উইকেটকিপার হলো রিন্টু, রিন্টু আমাদের টিমের ক্যাপ্টেনও।

দোদুল বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, ওদের দলের প্রথম ব্যাটসম্যান প্রস্তুত। বল ছুড়ে দিল দোদুল, ওদের ব্যাটসম্যান বেশ জোড়ে টোকা দিয়ে এক রান নিয়ে নিল।

দোদুল আবার বল ছুড়ে দিল, না এবার কোনো রান নিতে পারল না ওদের ব্যাটসম্যান।

এক ঘণ্টা তেতাল্লিশ মিনিট পর আমরা ওদের মাত্র ছয়টি উইকেট নিতে পেরেছি, ওভার চলে গেছে ৪৯ টা। ওরা রান করেছে ১১৯, এখন এক ওভার বাকি, এক ওভারে ওদের রান নিতে হবে পাঁচটি, চারটি নিলেও ওরা জিতে যাবে উইকেটের হিসাবে।

লাস্ট ওভারে বল করবে নূরুল। বল নিয়ে ও ছুটে আসছে, নূরুলের চোখ-মুখ আগুনের মতো লাল, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নূরুল বল ছুড়ে দিল, বল ব্যাটসম্যানের মাথার ওপর দিয়ে সোজা রিন্টুর হাতে গিয়ে পৌঁছল, কোনো রান হলো না।

এখন পাঁচ বলে পাঁচ রান দরকার। এরঁপর নূরুল আবার বল করল। ব্যাটসম্যান বলে ব্যাট লাগিয়েছে। বল উঁচুতে উঠেছে। দোদুল সেটা ক্যাচ ধরার জন্য হাত উঁচু করে এগিয়ে যাচ্ছে, উত্তেজনায় মাঠের চারপাশের সব দর্শক দাঁড়িয়ে পড়েছে। কেউ কোনো চিৎকার করছে না। সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে আছে দোদুলের দিকে। কিন্তু বলটা হাত ফসকে পড়ে গেল মাটিতে। হতাশায় 'আহ্' শব্দ করতে করতে আমাদের সমর্থকরা বসে পড়ল আবার। ওরা এরই মধ্যে দু রান নিয়ে নিয়েছে।

চার বলে এখন তিন রান দরকার। নূরুল আবার বল করল। এবার কোনো রান হলো না। এখন দরকার তিন বলে তিন রান।

আবার বল করল নূরুল। না, এবার কোনো রান হলো না।

দু বলে তিন রান দরকার এখন। নূরুল আবার এগিয়ে আসছে। শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে ও ছুটে আসছে। বলও ছুড়ে দিল শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে।

ওদের ব্যাটসম্যানও ব্যাট চালাল সমস্ত শক্তিতে। ব্যাটের সঙ্গে বল লেগে বল ছুটে যাচ্ছে মাঠের বাইরে। পেছন পেছন রিমন। বল ছুটছে, রিমন দৌড়াচ্ছে। বল আরো জোরে ছুটছে, মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছে বলটা, মাঠের বাইরে গেলেই চার রান, আমরা নিশ্চিত হেরে যাচ্ছি এ খেলায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে সবার। কিন্তু মাঠের শেষ প্রান্তের ঠিক কাছাকাছি গিয়েই বলটা ধরে ফেলল এবং যত দ্রুত সম্ভব ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুড়ে মারল রিন্টুর কাছে। দু রান নিয়ে নিয়েছে ওরা এর মধ্যে।

হতাশায় আমাদের সকলের চেহারা কেমন যেন কালো হয়ে গেল হঠাৎ। এখন এক বলে মাত্র এক রান দরকার।

আমরা সবাই একসঙ্গে হলাম, পরামর্শ করলাম। সবাই কেমন যেন দুর্বল দুর্বল হয়ে কথা বলল। কিন্তু নূরুল কোনো কথা বলল না।

মাঠের চারপাশের সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনায়। নূরুল মাঠের এ পাশে এসে ওর প্যান্টের সঙ্গে বলটা আস্তে আস্তে ঘষছে। ঘষতে ঘষতেই সে এগিয়ে আসছে, একটু একটু করে জোরে এগিয়ে আসছে। আরো জোরে এগিয়ে আসছে। নূরুল তার জীবনের সেরা দৌড় দিয়ে এগিয়ে আসছে এবং শরীরের যতটুকু শক্তি ছিল তা দিয়ে ছুড়ে মারল বলটা। বলটা এগিয়ে গেল দ্রুতগতিতে এবং সোজা সেটা আঘাত খেল ব্যাটের সঙ্গে। বলটা আবার চলে যেতে চাইছে মাঠের বাইরে। নূরুল যেদিক থেকে বল মেরেছে সেদিক দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে বল, নূরুল তাকিয়ে আছে বলের দিকে, তার যেন কোনো কিছু করার নেই। অবাক চোখে সে তাকিয়ে দেখছে বলটা। কিন্তু বলটা নিজের একেবারে কাছাকাছি আসতেই নূরুল হঠাৎ অদ্ভুত ডিগবাজির মতো একটা লাফ দিল। আমরা দেখলাম ডিগবাজি দিয়ে বলটা হাতের মুঠোয় নিয়ে নূরুল আরো একটা ডিগবাজি দিল এবং একসময় আমরা দেখলাম, নূরুল মাঠের ওপর গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে লাল টকটকে বলটা।

মাঠের চারপাশ থেকে আমাদের সমর্থকরা দৌড়ে আসছে নূরুলের দিকে, তার আগেই আমি আর রিন্টু গিয়ে নূরুলকে কাঁধে তুলে ফেললাম। সবাই নাচানাচি করছে, চিৎকার করছে, গান গাইছে। একটু দূরে দেখি দোদুল চশমা খুলে ওর চোখ মুছছে, ও কাঁদছে। সব সময় প্রথমে ফার্স্ট হওয়া দোদুল খেলায় হেরে যাওয়ার ভয়ে মুখটা শুকনো করে ফেলেছিল, খেলায় জিতে গিয়ে সে কাঁদছে, জিতে যাওয়ায় আনন্দে কাঁদছে।

নূরুল আস্তে করে আমাদের কাঁধ থেকে নেমে দ্রুত দোদুলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর দোদুলকে জড়িয়ে ধরে শব্দ করে কেঁদে ফেলল সেও।

খেলায় জিতে যাওয়ার আনন্দে বাসার ফিরেছি সন্ধ্যার বেশ পরে। সারা পাড়া জেনে গেছে আমাদের জেতার খবর। সবাই খুশি, আম্মা-আব্বাও খুশি। দেরি করে বাসায় ফেরার জন্য তাই কিছু বললেন না আজ।

একটু পর আম্মা এসে বললেন, 'দীপ্র, একটা চিঠি এসেছে তোর নামে।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে আমি আমার ঘরে চলে এলাম। অতি আগ্রহে চিঠিটা খুলেই চমকে উঠলাম আমি। চিঠিটা যত পড়ছি, ততই কাঁপছি আমি। আমার হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে, শরীর কাঁপছে। ভয়ঙ্কর এক চিঠি!

খুব গম্ভীর মুখে আমরা চারজন বসে আছি, কিন্তু নূরুল এখনো আসেনি। আজ আমাদের মিটিং আছে। যদিও আজ কোনো মিটিং হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু জরুরি একটা কারণে মিটিং ডাকা হয়েছে আজ। আর সে জরুরি কারণটা হলো—ভূতের চিঠি। গতকাল আমরা পাঁচজনই একটা ভূতের চিঠি পেয়েছি।

রিন্টু হঠাৎ একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'ভূত কি আমাদের ওপর খুব বেশি খেপেছে?

দোদুল চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে বলল, 'আমার তো তা-ই মনে হচ্ছে।'

'আমরা এমন কী করলাম যে আমাদের ওপর এত খেপবে।'

'তু-তু-তুই ভূতের বাড়িতে যাবি, তাকে বি-বি-বিরক্ত করবি, আর সে খেপবে না?' রিমন রেগে রেগে কথা বলল।

'কই বিরক্ত করলাম আমরা।' রিন্টুও রেগে গেল।

'কাল আসলে আমাদের ভূতের বাড়ির দিকে যাওয়াই উ-উ-উচিত হয়নি।' রিমন মিনমিন করে বলল।

'একটা বাড়িতে একটা মানুষ খুন হলো, আর সে বাড়িটা দেখতে যাব না, এটা কখনো হয়েছে?'

'তা হয়নি।'

'তাহলে? আমাদের ফাইভ ডট কমের কাজ কী? কোনো রহস্যজনক কিছু ঘটলে তার সমন্ধে খোঁজ নেওয়া, তাই না?' রিন্টু এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলল।

স্কুলের গেট দিয়ে নূরুলকে আসতে দেখা যাচ্ছে। খুব হাসি হাসি মুখ করে ও আমাদের দিকে আসছে। আমরা অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি। ভূতের চিঠি পেয়ে আমরা চিন্তায় মরে যাচ্ছি আর ও কিনা হাসছে। তাহলে কি ও ভূতের চিঠি পায়নি? কিন্তু রিমন যে বলল পেয়েছে! তাহলে?

হাসি হাসি মুখ করেই নূরুল আমাদের পাশে বসল। রিন্টু অবাক হয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'কিরে, হাসছিস যে?'

নূরুল আরো হেসে বলল, 'কেন, কাঁদার মতো কিছু হয়েছে নাকি?'

'হয়নি?'

'কী হয়েছে?'

'তুই জানিস না, কী হয়েছে?'

'আমি জানব কোথা থেকে?'

'বলিস কী? ভূতের চিঠি পাসনি তুই?'

'অ।' নূরুল শব্দ করে হেসে বলল, 'এই কথা।'

'ভূতের চিঠি পাসনি তুই?'

'তা পেয়েছি, কী হয়েছে তাতে?'

নূরুলের একটা হাত ধরে রিমন বলল, 'তোর ভ-ভ-ভয় লাগছে না?'

'নাহ্!'

'সত্যি ভ-ভ-ভয় লাগছে না?'

'বললাম তো, না।'

হতাশ হওয়ার মতো চেহারা করে আমরা নূরুলের দিকে তাকালাম। নূরুল হাসছেই। নূরুলের একটা হাত টান দিয়ে দোদুল বলল, 'এসব কী বলছিস তুই!'

নূরুল এবার অবাক হয়ে বলল, 'আমি আবার কী বললাম?'

'আমরা ভয়ে থরথর করে কাঁপছি, তুই দেখি দিব্যি হাসছিস!'

দোদুলের হাতটা চেপে ধরে দোদুল বলল, 'তুই বল তো, ভূত আমাদের কী করবে?'

'অনেক কিছুই তো করতে পারে।'

'যেমন?'

'ঘাড় মটকে ভেঙে ফেলতে পারে।' দোদুল বলল।

'তারপর?'

'পা-পা-পানির ভেতর চুবিয়ে মারতে পারে।' রিমন বলল।

'আবার গাছের আগায় নিয়ে মাটিতে ফেলেও দিতে পারে।' আমি বললাম।

দোদুল বলল, 'আরো অনেক কিছু করতে পারে।'

নূরুল বলল, 'তোরা এসব বিশ্বাস করিস?'

'কেন, তোর বিশ্বাস হয় না?'

'না।'

'কেন?'

নূরুল আবার হাসতে হাসতে বলে, 'ভূত কীভাবে হয় জানিস?'

'হ্যাঁ জানি। কেউ মারা গেলে ভূত হয়।'

'আমরা কি মরে গেছি, না বেঁচে আছি?'

'আমরা এখনো বেঁচে আছি।'

'এবার তাহলে বল, একজন জীবিত মানুষের সঙ্গে একজন মৃত মানুষের মারামারি লাগলে জিতবে কে?'

নূরুলের কথা শুনে আমরা হা হয়ে গেলাম। সত্যি তো, একজন মৃত মানুষ মানে একটি ভূত কীভাবে আমাদের মতো জীবিত মানুষের সঙ্গে পারবে? পেটের ভেতর কেমন গুরগুর করে উঠল আমার। বুকটা সাহসে ভরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

রিন্টু আগের মতোই গম্ভীর মুখে বলল, 'কিন্তু ভূতরা তো বাতাসের সঙ্গে মিশে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ পারে।'

'কিন্তু আমরা তো তা পারি না।'

'সেটা সত্য।'

'তাহলে?'

'তাহলে কী?'

রিন্টু গম্ভীর মুখে বলল, 'ভূতরা বাতাসে মিশে মিশে অনেক কাজই করতে পারে। যেমন ধর, তুই রাস্তা দিয়ে একা একা হেঁটে যাচ্ছিস, হঠাৎ পেছন থেকে কেউ একজন তোকে লাথি মারল। তুই পড়ে গিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলি, কেউ নেই। কাউকে খুঁজে না পেয়ে তুই চিন্তা করতে লাগলি। কিন্তু তুই বুঝতেও পারলি একটা দুষ্টু ভূত তোকে লাথি মেরেছে। আবার ধর, তুই ভাত খেতে বসেছিস। ভাতের প্লেটে হাত দেওয়ার আগেই দেখলি, প্লেটটা ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। তুই কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলি, প্লেটটা ভাসছে এবং একসময় ভাসতে ভাসতে সেটা তোর সামনে আগের জায়গায় চলে এলো। প্লেটটা দেখে তুই আরো বেশি চমকে উঠলি, কারণ প্লেটে কোনো ভাত নেই, তার জায়গায় গরুর গোবর রাখা আছে একগাদা। তাহলে?'

'হ্যাঁ, ভূতদের এ শক্তিটা আছে।' নূরুল মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল।

'এবার কী বলবি বল?'

'সে সমস্যার সমাধানও আমি নিয়ে এসেছি।'

'কী এনেছিস?' আমরা চারজন প্রায় একসঙ্গে বললাম।

'তাবিজ নিয়ে এসেছি।'

'তাবিজ!' দোদুল চোখ কুঁচকে বলল, 'তাবিজ পেলি কোথায় তুই?'

'বাবার ওষুধ আনার জন্য আমি একটা কবিরাজের কাছে যাই না মাঝে

মাঝে? তিনি দিয়েছেন।'

'এ তা-তা-তাবিজ পরলে কি আমরা ভূতদের মতো বা-বা-বাতাসে মিশে যেতে পারব?' রিমন ছলছল চোখে তাকিয়ে নূরুলকে বলল।

'না।'

'তাহলে?'

'এ তাবিজ পরলে ভূত কখনো আমাদের কাছে আসতে পারবে না।'

'সত্যি?' রিন্টু লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দোদুলও লাফিয়ে উঠল। রিমন কী যেন একটা বলতে গিয়ে তো-তো-তো করতে লাগল। আমি আস্তে করে ওর মুখটা চেপে ধরে বন্ধ করে দিলাম। তারপর নূরুলকে বললাম, 'তা কয়টা তাবিজ এনেছিস?'

নূরুল চোখ দুটো বেশ চালাকি চালাকি করে বলল, 'বল তো কয়টা এনেছি?'

রিমন অভিমানী গলায় বলল, 'নিশ্চয় একটা।'

নূরুলের হাসি হাসি মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'কিরে, কী হলো।'

নূরুল গম্ভীর মুখেই বলল, 'না, কিছু হয়নি।'

'তাহলে এ রকম গম্ভীর হয়ে গেলি কেন?'

'রিমন এমনভাবে কথাটা বলল।' নূরুল চোখ দুটো ছলছল করে বলল, 'আচ্ছা, তোরা বল, ভূত থেকে বাঁচার জন্য আমি একটা কিছু আনব, তা কেবল আমার জন্য আনব? তোদের জন্য আনব না! তোরা আমাকে এমন ভাবিস?' নূরুল ওর পকেট থেকে পাঁচটা তাবিজ বের করে বলল, 'এই দেখ, আমাদের পাঁচজনের জন্যই তাবিজ এনেছি আমি।' মাথাটা নিচু করে ফেলল নূরুল।

রিমনের দিকে তাকিয়ে দোদুল বলল, 'রিমন, তোর স্যরি বলা উচিত।'

রিমন নূরুলের দিকে একটু এগিয়ে যেতেই নূরুলও এগিয়ে এলো রিমনের দিকে। তারপর রিমনকে বলল, 'না না, দরকার নেই।'

রিমন খুব দুঃখী দুঃখী গলায় বলল, 'আমি স-স-স্যরি দোস্ত।'

নূরুল হেসে হেসে বলল, 'ওকে দোস্ত।'

সবাই আবার শান্ত হয়ে বসতেই দোদুল বলল, 'এবার তাহলে ভূতের চিঠিটা পড়া যাক। একজন পড়, আমরা সবাই শুনি।'

নূরুল ওর পকেটে হাত দিয়ে বলল, 'চিঠিটা তো বোধহয় হারিয়ে ফেলেছি।'

'আ-আ-আমি তাহলে পড়ি।' রিমন ওর পকেট থেকে চিঠিটা বের করে বলল।

রিন্টু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তাহলে তো তিন গুণ সময় বেশি লাগবে।'

রিমন চোখ কুঁচকে বলল, ' ক্যা-ক্যা-কেন?'

'ওই যে, তুই 'কেন' বলতে গিয়ে দুইবার ক্যা-ক্যা বলেছিস, তারপর 'কেন' বলেছিস, তিনবার বলতে হলো না। তাই তিন গুণ সময় লাগবে।'

দোদুল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দীপ্র, চিঠিটা বরং তুই পড়।'

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে আমি ভাঁজ খুলে মেলে ধরলাম। চিঠির ওপরের দিকে একটা কঙ্কালের ছবি, তার নিচ থেকে লেখা শুরু হয়েছে। চিঠিতে ভূত লিখেছে—

পাঁচ বিচ্ছুর দঁল

তোঁমরা খুঁব বাঁড়াবাঁড়ি শুঁরু কঁরেছ। যাঁ তোঁমাদের মোঁটেই উঁচিত হঁয়নি। আঁমরা খুঁব রাঁগ কঁরেছি। যঁদি আঁর কোঁনোদিন আঁমাদের বাঁড়ির দিঁকে আঁসার চেঁষ্টা কঁরো, তাঁহলে তোঁমাদের পাঁচজনকেই মেঁরে ফেঁলা হঁবে। তোঁমরা জাঁনতে চাঁও তোঁমাদের কীভাবে মেঁরে ফেঁলা হঁবে? তোঁমাদের হাঁত পাঁ বেঁধে গঁড়ের জঁঙ্গলে নিঁয়ে যাঁওয়া হঁবে, সেঁখানে সাঁপের এঁকটা আঁস্তানা আঁছে, সেঁখানে ফেঁলে দেঁয়া হঁবে। তাঁরপর দেঁখবে সাঁপের কাঁমড়ের কী মঁজা!

আঁর এঁকটা কঁথা, এঁ চিঁঠির কঁথা কাঁউকে জাঁনাবে নাঁ। যঁদি জাঁনাও তাঁহলেও মেঁরে ফেঁলা হঁবে তোঁমাদের। তঁবে এঁবার মেঁরে ফেঁলা হঁবে অঁন্য ভাঁবে— তোঁমাদের জিঁভ টাঁন দিঁয়ে বেঁর কঁরে কঁপালের সঁঙ্গে পেঁরেক দিঁয়ে গেঁথে দেঁওয়া হঁবে।

কঁথাটা বুঁঝতে পেঁরেছ তোঁ?

সুঁতরাং সাঁবধান।

ইঁতি
ভূঁতের বাঁড়ির
ভূঁত সর্দার।

চিঠিটা পড়া শেষ হতেই দোদুল বলল, 'কী বোঝা গেল এ চিঠিতে?'

'আমাদের সা-সা-সাবধান করে দিয়েছে ভূত সর্দার।' রিমন বলল।

'আমদের কি তাহলে সাবধান হওয়া উচিত?' দোদুল বলল।

'তার মানে কি?' রিন্টু একটু রেগে বলল।

'মানেটা হচ্ছে, আমরা ভূ-ভূ-ভূতের বাড়ি এখন যাব কি যাব না।'

'অবশ্যই যাব।' রিন্টু আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোরা কী বলিস?'

আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

নূরুল হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে রে। আমরা এ বিষয় নিয়ে আবার কাল কথা বলব। কাল ইংরাজি পড়া আছে। পড়তে হবে না আমাদের?'

আমরা পাঁচজন উঠে দাঁড়ালাম সঙ্গে সঙ্গে এবং বাসার দিকে পা বাড়ালাম।

বটগাছের মোড়ের ফাঁকা জায়গাটায় আসার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম আমরা। বাটলু দাঁড়িয়ে বটগাছের কাছে, পাশে ইয়া মোটা একটা মানুষও দাঁড়িয়ে আছে। রাগী চোখে তাকিয়ে আছে ওরা আমাদের দিকে। আমরা ওদের পাশ কেটে যেতেই মোটকু বলল, 'এই, তোরা দাঁড়া।'

আমরা দাঁড়িয়ে পরলাম। বাটলু ও মোটকু আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মোটকুর চোখে রাগ আর বাটলুর মুখে শয়তানি হাসি। রিমন আরো বেশি তোতলাতে বলল, 'চ-চ-চল দৌড়ে পালাই।'

নূরুল রেগে উঠে বলল, 'কেন?'

'ওই মোটকুটাকে দে-দে-দেখে তো মনে হচ্ছে পেটাবে আমাদের।'

'পেটাবে কেন?'

'দে-দে-দেখছিস না, কেমন করে আসছে!'

রিন্টু রাগে ফোঁস ফোঁস করে বলল, 'আসুক।'

মোটকুটি আমাদের সামনে এসে বলল, 'আমার দিকে তাকা তোরা।'

আমরা মোটকুর দিকে তাকালাম।

'কী দেখতে পাচ্ছিস?' Banglapdf.net

রিন্টু ফিক করে হেসে বলল, 'হাতির বাচ্চা।'

'কী!' মোটকু চোখ উল্টে আমাদের দিকে তাকাল।

নূরুল একটু এগিয়ে বলল, 'বড় ভাই, ওভাবে চোখ উল্টালে আপনি তো ট্যাড়া হয়ে যাবেন।'

'তোরা বেশি কথা বলছিস, জানিস, আমি কে?'

'জি জানি।' রিন্টুও একটু এগিয়ে গিয়ে বাটলুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার পাশে যখন একটা ছাগল দেখছি, আপনি তাহলে ছাগলের বাপ ছাগল।'

'কী এত বড় স্পর্ধা তোদের? জানিস, ক্যারাটে আমার ব্ল্যাক বেল্ট? তোদের হাড্ডিগুড্ডি আমি এক মিনিটে গুঁড়া করে দিতে পারি?'

'কেন আপনি হাড্ডিগুড্ডি গুড়ো করবেন?' নূরুল ধীরে ধীরে আরো রেগে যাচ্ছে।

'তোরা আমার কাজিন বাটলুকে এত বিরক্ত করিস কেন?'

'অ।' রিন্টু একটু হেসে বলল, 'আপনি তাই সেই অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন আমাদের মারার জন্য?'

'চোপ!'

'তা এসেছেন যখন, কী করবেন এখন আমাদের?' নূরুল আরো একটু এগিয়ে গেল।

'কী করব, দেখবি?' মোটকু ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

'হ্যাঁ দেখান।'

সঙ্গে সঙ্গে মোটকু নূরুলের গালে একটা রামথাপ্পড় মারল। রিন্টু দ্রুতগতিতে মোটকুর দিকে এগিয়ে যেতেই থেমে গেল। নূরুল দুহাত দুদিকে মেলে ধরে আমাদের বলল, 'তোরা একটু পিছিয়ে যা।'

আমরা তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম। নূরুল এবার চিৎকার করে বলল, 'বললাম না, পিছিয়ে যা! রিন্টু, তুই ওদের নিয়ে একটু পেছনে দাড়া। আমি না বলা পর্যন্ত এগিয়ে আসবি না, কারো গায়ে টাচও করবি না।' চোখ-মুখ শক্ত করে নূরুল বলল।

আমরা পিছিয়ে এলাম। থরথর করে কাঁপছে রিন্টু, রাগে যেন ও এখন ফেটে যাবে, দোদুল চশমাটা একবার খুলছে, একবার পরছে, রিমন হাত মুঠি করে দাঁড়িয়ে আছে।

নূরুল ওর বুকটা টানটান করে বলল, 'বাবা প্রায়ই বলেন, মানুষকে দুবার ক্ষমা করতে হয়। আমি আপনাকে একবার ক্ষমা করব। যদি আর কখনো আমাদের কারো গায়ে একটু টোকা দিয়েছেন, তো তখন আমি আপনাকে দেখে নেব।'

'তুই কী দেখে নিবি রে কালিয়া!' মোটকু ওর বিশাল দেহ নিয়ে নূরুলের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

'সরে যান বলছি।'

'না সরলে কী করবি?'

'কী করব?' বলেই নূরুল মোটকুকে হাঁটুর ওপর ধড়াম করে একটা লাথি মারল। কোঁত করে একটা শব্দ করে মোটকু বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মোটকু উঠে এসে নূরুলের দিকে এগিয়ে গেল। নূরুল একটু ডান পাশে সরে মোটকুর একেবারে পাছায় আরেকটা লাথি মারল।

প্রচণ্ড রেগে গেল এবার মোটকু। মহিষের মতো মাথা বাঁকিয়ে মোটকু এবার

দ্রুত এগিয়ে এসে নূরুলকে জাপটে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন একসঙ্গে পড়ে গেল মাটিতে। নূরুলও জাপটে ধরেছে, মোটকুও জাপটে ধরেছে নূরুলকে। ওরা গড়াগড়ি করতে লাগল মাটির ওপর। হঠাৎ নূরুলকে নিচে ফেলে মোটকু উঠে বসল ওর শরীরের ওপর। তারপর সোজা নূরুলের নাক বরাবর একটা ঘুষি মারল মোটকুটি। সঙ্গে সঙ্গে নূরুলের নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া শুরু করল। নিচ থেকে নূরুলও একটা ঘুষি মারল মোটকুর নাক বরাবর, কিন্তু ঘুষিটা ঠিক লাগল না। মোটকু এবার দু হাত দিয়ে নূরুলের গলা চেপে ধরল। নূরুলের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যাচ্ছে, গলা দিয়ে গোঁত গোঁত শব্দ হচ্ছে, নূরুলের সারা মুখ লাল হয়ে গেছে। রিন্টু দ্রুত দৌড়ে গিয়ে নূরুলের মুখের সামনে গিয়ে বলল, 'নূরুল, তুই তো মরে যাচ্ছিস, আমি ধরব এ হাতির বাচ্চাকে?' নূরুল ডান হাত তুলে ইশারা করে 'না' বলল। রিন্টু আবার বলল, 'তুই তো মরে যাচ্ছিস নূরুল।' নূরুল আবার 'না' করল। রিন্টু রাগে মাটিতে কিলাতে লাগল আর হো-হো করে কাঁদতে লাগল। নূরুল একবার চোখ দুটো বাঁকা করে রিন্টুর দিকে তাকাল। রিন্টুর কান্না দেখে কী যেন হয় ওর ভেতর। মোটকুকে সঙ্গে নিয়ে ও শ্লো-মোশনের মতো উঠে দাঁড়াল। তারপর মাত্র দুই সেকেন্ড, নূরুল প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল মোটকুর নাক বরাবর, এবার মিস হলো না। মোটকুর নাক ফেটে ঝরঝর করে রক্ত পড়া শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে নূরুল আরেকটা ঘুষি মারল। কাত হয়ে পড়ে গেল এবার মোটকু। লাফ দিয়ে মোটকুর শরীরের ওপর বসে পড়ে নূরুল এবার গলা চেপে ধরল ওর।

বেশ কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখার পর দোদুল দৌড়ে গিয়ে নূরুলের হাত ধরে বলল, 'দোস্ত, মোটকুটা মারা যাবে, তুই ছেড়ে দে।'

নূরুল তবুও ছাড়ে না।

এবার রিন্টু আর দোদুল একসঙ্গে বলে। তবুও নূরুল ছাড়ে না। শেষে আমরা চারজন নূরুলকে টেনে ধরে মোটকুর কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনি। মোটকুর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে, হা করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে, পেটটা একবার উঠছে আরেকবার নামছে।

নূরুলের রাগ কমছে না, ও আবার এগিয়ে গিয়ে মোটকুর পেটে একটা লাথি দিতে চায়, কিন্তু আমরা তার আগেই ওকে আবার টেনে ধরি।

আস্তে আস্তে মোটকু উঠে দাঁড়ায়। সারা মুখ কান্না কান্না হয়ে গেছে ওর।

নূরুল একটু এগিয়ে গিয়ে মোটকুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'ব্ল্যাক বেল্ট, ট্র্যাক বেল্ট জানি না। এই যে হাতটা দেখছিস, এ হাত দিয়ে প্রতিদিন বাবার সঙ্গে

মাঠের মাটি কাটি কোদাল দিয়ে, এ হাত দিয়ে নদী থেকে পানি দিই ক্ষেতে, এ হাত দিয়ে গাছ বুনি, এ হাত দিয়ে পাখির ছানাদের আদর করি। এ হাত বড় শক্ত হাত মোটকু, নিশ্চয় টের পেয়েছিস এতক্ষণে।'

বাটলু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নূরুল ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'শোন বাটলু, এর আগে একবার স্যারকে মিথ্যে কথা বলে আমাদের মার খাইয়েছিস তুই, এবার তোর খালাতো ভাইকে ডেকে এনে আরেকটা অন্যায় করেছিস। মোট তাহলে দুটো অন্যায় হলো। এরপর আরেকটা অন্যায় হলে—।'

নূরুল কথাটা শেষ করার আগেই রিন্টু বলল, 'তোকে তাহলে এবার আগুনে পুড়িয়ে কাবাব বানিয়ে খাব।'

ক্লাসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রিমন আমাকে ফিসফিস করে বলল, 'স্কুলে আসতে কোনো কিছু কি খেয়াল করেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'একটা লোক পিছু পিছু ফলো করছিল আমাকে?'

রিমন চোখ বড় বড় করে বলল, 'আমাকেও।'

'চল, জামতলায় যাই।'

'হ্যাঁ চল। রিন্টু, দোদুল, নূরুলকে হেড স্যার ডেকেছেন। ওরা ওখান থেকে জামতলায় যাবে।'

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। ক্লাস শুরু হতে আরো প্রায় বিশ মিনিট বাকি। রিমনকে বললাম, 'ব্যাপার কী বল তো?'

'আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না রে।'

'আরেক সমস্যা মনে হচ্ছে।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।'

জামতলায় এসে দেখি ওরা তিনজন এসে গেছে, কী নিয়ে যেন গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। দোদুল আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কথাটা শুনেছিস তো?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। রিমন বলেছে, লোকটা আমাকেও ফলো করেছে।'

'আচ্ছা বল তো লোকটা দেখতে কেমন?'

'বেঁটেমতো, চোখ দুটো ছোট ছোট, অল্প অল্প টাক পড়েছে মাথায়।

দোদুল বলল, 'আমার পেছনেও তো এ লোকটাই আসছিল।'

'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, কে না কে। পরে খেয়াল করে দেখি, লোকটা আমাকে ফলো করছে। আমি একবার মিমি কেনার জন্য এক দোকানে ঢুকেছি, চেয়ে দেখি লোকটাও একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।' আমি বললাম।

'বলিস কি!' রিন্টু লাফ দেয়ার মতো করে বলল, 'আমি, দোদুল আর নূরুল

একসঙ্গে আসছিলাম। আমরা চিপস কেনার জন্য চার রাস্তার মোড়ের দোকানটায় থামতেই দেখি একটা লোক একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। আমরা চিপস কিনে হাঁটা শুরু করলাম, লোকটাও আমাদের পেছনে পেছনে হাঁটা শুরু করল।'

বুকের ভেতর কেমন যেন করে উঠল আমার। ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'লোকটা কে?'

'এ প্রশ্ন তো আমাদেরও।' রিন্টু বলল।

'আচ্ছা, ভূত তো মাঝে মাঝে মানুষের রূপ ধরতে পারে, লোকটা ভূত না তো?' আমি দোদুলকে বললাম।

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।' দোদুল বলল।

'ধ্যাত, ভূত তো দিনের বেলা বের হতে পারে না। দিনের বেলা ওরা লুকিয়ে থাকে, রাতে বের হয়।' দোদুলের দিকে তাকিয়ে রিন্টু বলল।

'কিছুটা পেঁচার মতো?' দোদুল বলল।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে লোকটা কে হতে পারে?' নূরুল ওর ঠোঁট দুটো দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে চিন্তা করতে লাগল।

'আ-আ-আরেক ঝামেলায় পড়া গেল।' রিমনও চিন্তা করতে লাগল।

'ঝামেলা তো বটেই, মহা ঝামেলা!'

ঘণ্টা পড়ে গেল ক্লাসের। লোকটাকে নিয়ে আর কথা বলা হলো না।

রশীদ স্যার ক্লাসে ঢুকেই প্রতিদিনের মতো হেসে ফেললেন আজও। স্যারের হাতে দুটোয় কিসের যেন প্যাকেট। কিন্তু স্যারকে আজ বড্ড ম্লান লাগছে। পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের কখনো হাসি হাসি মুখ ছাড়া মানায় না, রশীদ স্যার সে রকম। ব্যাপারটা খেয়াল করে দোদুল বলল, 'স্যার, আপনার কি মন খারাপ।'

'না।'

'তাহলে কি শরীর খারাপ?'

'তোর কী মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয় মন খারাপ।'

'তুই কি আমাকে কখনো মন খারাপ করতে দেখেছিস?'

'কালকে আপনি স্কুলে আসেননি, আজও আপনাকে দেখে কেমন যেন

লাগছে, তাহলে বোধহয় আপনার শরীরটা খারাপ?'

'হ্যাঁ রে, শরীরটা কাল খারাপ ছিল, জ্বর এসেছিল। আজও শরীরটা তেমন ভালো না, তবুও একটা কারণে চলে এলাম।'

'কারণটা কী বলা যাবে?'

'হ্যাঁ, বলা যাবে।' রশীদ স্যার একটু থেমে বলেন, 'তোরা পরশুদিন ক্রিকেট খেলায় জিতলি আর তোদের আমি অভিনন্দন জানালাম না, এটা কি হয়?'

রিন্টু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, দুটো প্যাকেট এনেছেন ক্লাসে। ওগুলো কিসের প্যাকেট?'

'বল তো, কিসের প্যাকেট?'

'সম্ভবত মিষ্টির।'

'ঠিক বলেছিস!'

'মিষ্টি কেন স্যার?'

'এটাও বল তো কেন?'

রিন্টু একটু চিন্তা করে বলল, 'স্যার, বলব?'

'বল।'

'নির্ভয়ে বলব?'

'ভয়ের কী আছে, বল।'

'স্যার, আপনি বোধহয় বিয়ে করেছেন?' হো হো করে হেসে উঠলেন রশীদ স্যার বললেন, 'মানুষ কয়বার বিয়ে করে রে গাধা!'

'অনেকবার করে।'

'তুই জানিস, অনেকবার করে?'

'হ্যাঁ, এই তো ক'দিন আগে বাটলুর দাদা বিয়ে করল আরেকটা। কাউকে দাওয়াত না দিয়ে চুপি চুপি আমাদের কজনকে দাওয়াত দিয়েছিল বাটলু। বাটলুর নতুন দাদীটা না অনেক সুন্দর!'

'এই বুড়ো বয়সে বিয়ে !' স্যার বাটলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিরে বাটলু কথাটা কি সত্য?'

বাটলু কান্না কান্না মুখ করে বলল, 'একদম মিথ্যে কথা স্যার। আমার দাদা অনেক দিন আগে মারা গেছেন।'

রিন্টু সঙ্গে সঙ্গে জিভ কেটে বসে পরল। তারপর বসে থেকেই বাটলুকে উদ্দেশ করে জোরে জোরে বলল, 'স্যরি রে বাটলু, মাফ করে দিস দোস্ত।'

রশীদ স্যার আবার হেসে বললেন, 'এ মিষ্টিগুলো হচ্ছে, তোদের ক্রিকেট

খেলায় জেতার মিষ্টি, আমার পক্ষ থেকে।'

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে পলি, রুবা, ছন্দা চিৎকার করে উঠল, এপাশ থেকে লুলু, রিন্টু, রিমন টেবিল চাপড়াতে লাগল আনন্দে।

টিফিন পিরিয়ডে আমরা আবার জামতলায় বসলাম লোকটাকে নিয়ে আলোচনা করতে। অনেক আলোচনার পর আমরা বুঝতে পারলাম না, লোকটা আসলে কে?

রিন্টু শেষে কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'আপাতত এটা থাক। আমি এখন একটা ভয়ঙ্কর কথা বলতে চাই।'

নূরুল চোখ দুটো ছোট ছোট করে বলল, 'ভয়ঙ্কর কথা? বল।'

'আমি আজকে আবার ভূতের বাড়ি যেতে চাই।'

নূরুল খপ করে রিন্টুর হাত চেপে ধরে বলল, 'আমি এখনই এ কথা বলতে চাইছিলাম। আমি রাজি?' দোদুল, রিমন আর আমার দিকে তাকিয়ে নূরুল বলল, 'তোরা?'

আমি আর দোদুল সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম, একটু গাইগুই করে শেষে রিমনও রাজি হয়ে গেল।

রিন্টু একটু সোজা হয়ে বসে বলল, 'এবার আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলব। আজ আমরা ভূতের বাড়ি যাব অন্য রাস্তা দিয়ে। খালের ওপাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে সেই রাস্তা দিয়ে।'

'একটু দূর হয়ে যায় না?' দোদুল বলল।

'তা যায়। কিন্তু এবার আগের রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না। আমরা সবাই খালের পাশে যে উঁচু জায়গাটা আছে সেখানে জড়ো হব প্রথমে।'

'আজও কি রাত সাড়ে বারোটায়!' আমি বললাম।

'না, আজ একটায়।' রিন্টু ঘড়ি দেখে বলল, 'আজ আর কোনো কথা নয়। যার যা প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে নিয়ে নেব আমরা। ওকে?'

খালের এই জায়গাটা নাকি খুব খারাপ। অনেকে নাকি মাথাকাটা মানুষ হাঁটতে দেখেছে এখানে। কিন্তু আমরা পাঁচজন দাঁড়িয়ে থেকে চারদিকে তাকিয়ে কোনো কিছু দেখতে পেলাম না। দোদুল কিছুটা হতাশ হয়ে বলল, 'সব চাপা। মাথাকাটা

মানুষ আবার হাঁটতে পারে নাকি! চল।'

খালের ওই উঁচু জায়গা থেকে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ভূতের বাড়ির কাছাকাছি চলে এলাম। রিন্টু ওর রেডিয়াম ঘড়ি দেখে বলল, 'ভূতের বাড়িতে পৌঁছতে সাত মিনিট লেগেছে।'

আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ভূতের বাড়ির ঠিক পেছনে। দোদুল ফিসফিস করে সবাইকে বলল, 'এখন কোনো শব্দ করা যাবে না। আমরা খুব নিঃশব্দে এগোব। ডান পাশে বাড়ির যে দেয়ালটা আছে, তার নিচের কিছু অংশ ভাঙা। আমরা ছোট মানুষ, খুব সহজে সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পারব, কিন্তু বড় মানুষ পারবে না।'

রিন্টু কথাটা শুনে বলল, 'আমি আগে ঢুকব, তারপর নূরুল, তারপর দোদুল, দীপ্র, আর শেষে রিমন। আর একটা কথা, ভুলেও হাঁচি দেওয়া যাবে না, ঘড়ির বোতাম টিপে আলো জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখা যাবে না। এমনকি সামান্য 'উঁহ' শব্দও করা যাবে না।'

আরো একটু এগিয়ে গিয়ে রিন্টু প্রথমে ভূতের বাড়ির ভাঙা দেয়ালের মাঝে মাথা ঢুকিয়ে দিল। খুব সহজেই ওকে যেতে দেখে আমরা চারজনই ঢুকে পড়লাম বাড়ির ভেতর। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দু হাত সামনেও কোনো কিছু দেখা যায় না। নূরুল আমাদের কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'ওই দেখ, কে যেন আলো জ্বেলে হেঁটে যাচ্ছে।'

চোখ বড় বড় করে আমরা দেখলাম, কালোমতো একটা ছায়া হেঁটে যাচ্ছে, তার হাতে একটা মোমবাতি।

দোদুল হাত দিয়ে ইশারা করে আমাদের বুঝিয়ে দিল, আমাদের আরো একটু এগিয়ে যেতে হবে এবং ওপাশে একটা মোটা দেয়াল আছে, সেখানে লুকিয়ে থাকতে হবে।

আমরা দোদুলের কথামতো এগিয়ে গিয়ে সামনের দিকে আরো একটু এগিয়ে গেলাম এবং মোটা দেয়ালের কাছে পৌঁছেই লুকিয়ে পড়লাম তার আড়ালে। কিছুক্ষণ পর রিমন কান্না কান্না কণ্ঠে বলল, 'দো-দো-স, মশা রে।'

'চুপ।' রিন্টু ফিসফিস করে বলল, 'বাঁ দিকে তাকা।'

বাঁ দিকে তাকিয়েই আমরা দেখলাম, মোমবাতি হাতে ছায়াটা এগিয়ে আসছে এদিকে, পেছনে পেছনে আরো তিনটি ছায়া। ছায়াগুলো আরো একটু এগিয়ে আসতেই আমরা টের পেলাম, ওগুলো ছায়া না, মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেলাম। এত রাতে এখানে মানুষ! ভূতের বাড়িতে এত

রাতে কী করে মানুষগুলো?

চারজন মানুষ মোটা দেয়ালের ওপাশে কী যেন টেনে নিয়ে বসল। পুরাতন চেয়ার-টেবিলের মতো মনে হলো। হঠাৎ একজন গমগম গলায় বলল, 'এবার খবর বলো জুলমত খাঁ।'

'ওস্তাদ। খবর সব ঠিক আছে। আমরা কালকেই লোকটাকে ধরে আনব এখানে।'

'কেন, টাকা দিতে রাজি হয় নাই?'

'না ওস্তাদ।'

'এখানে ধরে আনলে কি রাজি হবে?'

'না হলে আগেরটার মতো মাইর‍্যা ফালামু।'

'গতবার তো আমরা একটা বাচ্চাছেলেকে মেরে ফেলেছিলাম, না?'

'জি ওস্তাদ। ওর বাপ টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় তার পাগল ধরনের ছেলেটাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিলাম। তবুও রাজি হলো না ছেলেটার বাবা। শেষে তাই—।'

'আচ্ছা, কালকে যে লোকটাকে ধরে আনব এখানে, তার টাকা-পয়সা আছে কেমন?'

'বহুত টাকা আছে ওস্তাদ।'

'তোমাদের কী মনে হয়, এখানে ধরে আনলে টাকা সে দেবে?'

'ওই যে কইলাম ওস্তাদ, না দিলে গলাটা কাইট্যা ফালামু!'

কথাটা শুনেই খুক করে কেশে উঠল রিমন। সঙ্গে সঙ্গে গমগম গলায় লোকটা বলল, 'কার যেন শব্দ শুনলাম। দেখ তো, কেউ লুকিয়ে আছে কি না দেয়ালের ওপাশে।'

চারজনের একজন বলল, 'ওস্তাদ যে কী কন, এত রাইতে এখানে আইব কেডা। শেয়াল-টিয়াল বোধহয় আশেপাশে ঘোরাফেরা করতাছে।'

'এখানে শেয়াল আসবে কোথা থেকে?'

'ওই যে পুবপাশের দেয়ালের নিচে একটু ভাঙা আছে?'

'অ, আচ্ছা।' ওস্তাদ লোকটা বলল, 'তাহলে ওই কথাই রইল। কালকে লোকটাকে ধরে আনছি আমরা। আগামীকাল রাতে এখানেই দেখা হবে আমাদের, ওকে?'

বাকি তিনজন একসঙ্গে বলল, 'ওকে ওস্তাদ।'

গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে গেছে আমাদের। এত দিন জেনে এসেছি এটা

ভূতের বাড়ি, কিন্তু আসলে এখানে সন্ত্রাসীদের আস্তানা। পেটের ভেতর কেমন যেন করে উঠল আমার। গলাটা শুকিয়ে গেছে, প্রচণ্ড পিপাসা বোধ হচ্ছে এখন। দ্রুত এখান থেকে বের হওয়া দরকার।

ভাঙা দেয়ালের কাছে এসে রিমনকে প্রথমে বের হতে বলল রিন্টু, তারপর আমি, দোদুল, নূরুল আর রিন্টু।

সন্ত্রাসীদের আস্তানা থেকে যত তাড়াতাড়ি এবং নিঃশব্দে সম্ভব খালের উঁচু জায়গায়টায় চলে এলাম। তারপর পাঁচজন একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালাম বাড়িটির দিকে। মোমবাতি হাতে নিয়ে এক সন্ত্রাসী এগিয়ে যাচ্ছে, পেছন পেছন বাকি তিনজন। এখান থেকে মনে হয়, চারজন ভূত এগিয়ে যাচ্ছে একটা আলো নিয়ে!

কাল রাতে বাসায় ফেরার পর আমরা কেউই আর ঘুমাতে পারিনি। আমাদের ক্লাস শুরু হয় সকাল এগারোটায়, আমরা আজ নয়টার সময় স্কুলে এসে উপস্থিত হয়েছি। নূরুল আজও আসতে দেরি করছে।

প্রায় এক ঘণ্টা চলে গেল, নূরুল তবুও এলো না। রিন্টু কপাল-ভাঁজ করে বলল, 'নূরুলের কোনো অসুবিধা হলো না তো?'

'ওর বাবা তো অসুস্থ, ওষুধ আনতে আজকেও কবিরাজের কাছে গেল কি না?' দোদুল বলল।

'কিন্তু ও তো পরশুদিন কবিরাজের কাছে গিয়েছিল। কাল রাতে বাসায় ফেরার সময় ও বলল না, আগামীকাল কোনো কাজ নেই! নয়টার সময় স্কুলে আসবে ও!'

আমি বললাম, 'আরো একটু অপেক্ষা করে দেখি ও আসে কি না।'

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ে গেল, নূরুল তবুও এলো না। ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলাম আমরা। সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে জরুরি মিটিং আছে আমাদের, কিন্তু নূরুলকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারছি না। প্রচণ্ড রকম মন খারাপ হয়ে গেল আমাদের।

তৃতীয় ঘণ্টায় রশীদ স্যার ক্লাসে এসে আমাদের বললেন, 'কিরে, তোরা আজ এত চুপচাপ কেন?'

আমরা কিছু বললাম না।

'নূরুলকেও তো দেখছি না আজ।'

এবারও কিছু বললাম না।

'কোনো সমস্যা?'

আমরা এবারও কেউই কিছু বললাম না।

নূরুলের জন্য ভীষণ মন খারাপ লাগছে আমাদের। কত দিন ধরে আমরা একসঙ্গে ক্লাস করি, কেউ কোনো দিন ক্লাস মিস করিনি। আজ নূরুলকে ছাড়াই ক্লাস করতে হচ্ছে।

চার ঘণ্টা পর আমাদের আর ক্লাস করতে ইচ্ছে হলো না। স্যারকে বলে

আমরা ছুটি নিয়ে নিলাম। বিকেলে নূরুলদের বাসায় যাব আমরা। ওদের বাসাটা আমাদের বাসা থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে। আমি দুদিন গিয়েছিলাম ওদের বাসায়। রিন্টু, দোদুল, রিমন তাই বিকেলে আমার বাসায় আসবে, তারপর একসঙ্গে আমার রওনা দেব নূরুলদের বাসায়।

নূরুলদের বাসার কাছাকাছি এসেই থমকে দাঁড়ালাম আমরা। ওদের বাসার সামনে অনেকগুলো মানুষ জড়ো হয়ে আছে। বেশ কয়েকজন মহিলার কান্না আসছে বাসার ভেতর থেকে।

বুকের ভেতর ছ্যাঁত করে উঠল আমাদের। নূরুলের কি কঠিন কিছু হয়েছে? দ্রুত পা চালিয়ে আমরা ওর বাসার দিকে গেলাম। আমাদের দেখেই নূরুল এগিয়ে এসে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'বাবা না মারা গেছে রে!'

মূর্তির মতো চারজন আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। নূরুল কাঁদছে, আমাদের প্রিয় বন্ধু কাঁদছে, ওর বাবা মারা গেছে, আমাদের এখন কী করা উচিত? কিছুই বুঝতে পারছি না আমরা।

বৃদ্ধমতো একটা লোক নূরুলকে জড়িয়ে ধরে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখলাম, নূরুল বৃদ্ধ লোকটার বুকের মধ্যে মাথা ঠেকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, আর লোকটা নূরুলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর চশমা পরা একজন ভাইয়া এসে বললেন, 'তোমরা তো নূরুলের বন্ধু।'

রিন্টু বলল, 'জি।'

'তোমরা কি আমার সঙ্গে একটু এদিকে আসবে?'

নূরুলদের বাসা থেকে কিছুটা দূরে একটা গাছের নিচে দাঁড়ালেন চশমা পরা ভাইয়াটি। আমরা তার পাশে দাঁড়াতেই তিনি কিছুক্ষণ আমতা আমাত করে বললেন, 'নুরুলের বাবা আসলে মারা যাননি।'

দোদুল চমকে উঠে বলল, 'তাহলে?'

'তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

'কেন?'

'সে কথাই বলার জন্য তোমাদের এখানে ডেকেছি।'

'ভাইয়া, তার আগে বলুন, নূরুল কিছু করেনি তো!' রিন্টু কাতর হয়ে বলল।

'না না, ও কিছু করেনি। ও ওর বাবাকে এত বেশি ভালোবাসে, যা আজকাল

ছেলে-মেয়েদের মাঝে দেখা যায় না।'

'ঘটনাটা যদি একটু দ্রুত বলতেন ভাইয়া তাহলে একটু শান্ত হতাম। কেমন যেন লাগছে আমাদের।' আমি চশমা পরা ভাইয়ার দিকে আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বললাম।

'হ্যাঁ বলছি। নূরুলদের ডান পাশের পরের বাড়িওয়ালা খুব খারাপ মানুষ। তিনি নূরুলদের তেমন দেখতে পারতেন না। নূরুলরা গরিব। তিনি প্রায়ই নূরুলের বাবাকে বলতেন, নূরুলদের জায়গাটা তার কাছে বিক্রি করে অন্য এক জায়গায় কম টাকায় জায়গা কিনে বাড়ি করতে। নূরুলের বাবা এতে রাজি হননি। সে থেকেই ওই বাড়িওয়ালা নূরুলদের একদম সহ্য করতে পারতেন না।

গত পরশুদিন ওই বাড়িওয়ালার একটা ছাগল হারিয়ে যায়। অনেক খুঁজেও ছাগলটা না পেয়ে তিনি বেশ রেগে ছিলেন। গতকাল সন্ধ্যার সময় বাড়িওয়ালা প্রায় খেয়ে ফেলা একটা ছাগলের মাথা খুঁজে পান নূরুলদের বাড়ির পেছনে। ছাগলটার মাথার চামড়ার রঙের সঙ্গে নাকি তার হারিয়ে যাওয়া ছাগলের রঙ মিলে যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছাগল চুরির জন্য নূরুলের বাবাকে দোষারোপ করেন এবং আজ সকালে এ নিয়ে একটি বিচার বসান। ওই বাড়িওয়ালা বড়লোক, অনেক টাকা-পয়সা তার, বিচারও হয় তার সুবিধা অনুযায়ীই। ছাগল চুরির দায়ে নূরুলের বাবাকে ন্যাড়া করে দেওয়া হয় এবং গলায় জুতোর মালা পরিয়ে সারা এলাকা ঘোরানো হয়।'

'নূরুলের বাবা কি সত্যি সত্যি ছাগলটা চুরি করেছিলেন?' রিন্টু দ্রুত কথাটা জিজ্ঞাসা করে চশমাওয়ালা ভাইয়াকে।

'নাহ্।'

'তাহলে?'

'ওই যে বললাম না, টাকাওয়ালা মানুষ, অনেক টাকা-পয়সা তার। জায়গা বিক্রি করতে চায়নি, বহুদিনের রাগ ছিল নূরুলের বাবার ওপর, তাই কায়দা করে তাকে ছাগল চোর বানিয়ে ওরকম শাস্তি দিল।'

'নূরুল কিছু বলল না?' দোদুল জিজ্ঞাসা করল।

'ও কী করবে, ছোট মানুষ ও। এলাকায় মুরব্বিরা যা বলেন তা-ই তো মানতে হবে।'

'তারপর?'

'তারপর সবকিছু শান্ত হয়ে এসেছিল, নূরুলের বাবাকে ন্যাড়া করে, গলায় জুতোর মালা পরিয়ে সারা এলাকা ঘোরানোর পর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাড়িতে ঢুকেই তিনি চুপচাপ বসে রইলেন আগের মতো, কোনো কথা বললেন না কারো সাথে। কিন্তু অসুবিধা শুরু হলো ঘণ্টা দুয়েক আগে।'

'কী অসুবিধা!' দোদুল বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে চশমাওয়ালা ভাইয়ার দিকে।

'খবর পাওয়া যায় আমাদের এ এলাকা থেকে তিন এলাকা পরে একটা ছাগলের খোঁয়াড়ে আটকে রাখা হয়েছে বাড়িওয়ালার সে ছাগলটিকে। বাড়িওয়ালা গিয়ে সে ছাগলটা ফেরত আনেন। এ ঘটনাটা জানতে পারেন নূরুলের বাবাও। কষ্ট, দুঃখ আর অপমানে তিনি ঘরের সিলিংয়ের সঙ্গে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।

'তাহলে নূরুলদের বাড়ির পেছনে যে খেয়ে ফেলা ছাগলের মাথাটা পাওয়া যায় সেটা কোন ছাগলের মাথা ছিল?'

'সেটা অন্য কোনো ছাগলের ছিল, শিয়াল-কুকুর হয়তো কোনো জায়গা থেকে এখানে এনে খেয়ে ফেলে রেখেছিল।'

'এখন কী হবে!' রিন্টু বলল। ওর সারা মুখ লাল হয়ে গেছে রাগে।

'এখন আর কী হবে? বড়লোকদের কোনো বিচার হয় নাকি!' চশমাওয়ালা ভাইয়াটি কথাটা বলে থুঃ করে থুথু ফেললেন একপাশে।

আমরা চারজন চুপচাপ বসে রইলাম অনেকক্ষণ। আমাদের চোখেল সামনে শুধু নূরুলের মুখটা ভাসছিল। নূরুল কাঁদছে।

সকালে স্কুলে এসে আমরা যা শুনলাম, তাতে সমস্ত স্কুল দুলে উঠল আমাদের চোখের সামনে। রিন্টু তো ধপাস করে বসে পড়ল মাঠের ভেতর, দোদুল চশমাটা খুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সামনের দিকে, রিমন কান্না কান্না মুখ করে মাঠের ঘাস টেনে ছিঁড়তে লাগল রিন্টুর পাশে বসে। নূরুল নাকি ওর বাবার গাছ কাটার দা দিয়ে রাতে কুপিয়ে এসেছে সেই ছাগলের মালিককে। ছাগলওয়ালার অবস্থা তেমন ভালো না, যে কোনো সময় একটা কিছু হয়ে যেতে পারে। পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেছে নূরুলকে।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবে বসে থাকার পর পিয়ন চাচা এসে বললেন, 'হেড স্যার আপনাদের ডেকেছেন।' আমরা দ্রুত হেড স্যারের রুমের দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু রুমে ঢুকেই দেখি স্কুলের সব স্যারই বসে আছেন হেড স্যারের রুমে। রশীদ স্যারও আছেন, সবার মুখ গম্ভীর। হেড স্যার খুব নরম গলায় বললেন, 'ও এমন পাগলামি করল কেন বলো তো তোমরা?'

রিন্টু সঙ্গে সঙ্গে বেশ শব্দ করে বলল, 'স্যার, এটা পাগলামি না।'

'তাহলে?'

'নূরুলের বাবা ছাগল চুরি করেনি, তবুও তাকে যা করা হয়েছে, তাতে কারোরই মাথা ঠিক থাকার কথা না।'

'নূরুল তো কেবল সেই বজ্জাত ছাগলওয়ালাকে কুপিয়ে এসেছে, আমি হলে এক কোপে মাথা কেটে ফেলতাম।' দোদুল বলল।

'না না, এমন মাথা গরম করা ঠিক না।' হেড স্যার মাথা এদিক-ওদিক করে বললেন।

'স্যার, আপনি একবার ভেবে দেখুন, আপনার বাবাকে বিনা অপরাধে অনেকগুলো মানুষের মাঝে মাথা ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছে, শেষে জুতোর মালা পরিয়ে সারা এলাকা ঘুরিয়ে আনা হয়েছে, তখন আপনার কেমন লাগত।' দোদুল ফোঁস ফোঁস করে বলল, 'এখন আমাদের ইচ্ছে করছে সেই ছাগলওয়ালার বাড়িটাতে আগুন লাগিয়ে ছাই করে ফেলতে।'

'না, এমন করা যাবে না। ছাগলওয়ালা লোকটা এখন বেঁচে থাকলে হয়, বিপদ তাহলে কমে যেত একটু। নূরুল এখন কোথায় আছে তোমরা জানো?'

'পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, এটা জানি, কিন্তু কোথায় আছে তা জানি না।' রিন্টু হেড স্যারের দিকে তাকাল।

'চার রাস্তার মোড় থেকে ডান দিকে যে রাস্তাটা গেছে, সেই রাস্তার শেষ দিকে নিরিবিলি একটা জায়গা দেখবে। সেখানে কিশোর সংশোধন কেন্দ্র নামে বেশ কয়েকটা বিল্ডিং আছে, নূরুলকে এখন সেখানেই রাখা হয়েছে। স্কুল ছুটির পর কিংবা বিকেলে তোমরা ওকে দেখতে যেয়ো। কিশোর সংশোধন কেন্দ্রের বড় অফিসার আমার ছাত্র ছিল, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, তোমরা এ চিঠিটা তাকে দেখালেই নূরুলের কাছে নিয়ে যাবে তোমাদের।'

'আমরা নূরুলের জন্য এখন কী করতে পারি স্যার?' দোদুল কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

'কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করব, তা ছাড়া রশীদ স্যার আছেন, জামান স্যার আছেন, আরো অনেক স্যার আছেন তোমাদের, তারাও যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন নূরুলের ব্যাপারে। তোমরা শুধু নূরুলকে দেখতে যেয়ো মাঝে মাঝে। ও তোমাদের ছেড়ে একা একা আছে তো ওখানে, নিশ্চয় মন খারাপ করে আছে সে।'

হেড স্যার একটা চিঠি লিখে আমাদের হাতে দিলেন, আমরা বের হয়ে এলাম স্যারের রুম থেকে।

বিকেলবেলা কিশোর সংশোধন কেন্দ্রের সামনে এসে বুকের ভেতর হু হু করে উঠল আমাদের। আমাদের প্রিয় বন্ধু নূরুল আছে এখানে, আমাদের ছেড়ে একা একা সময় কাটাচ্ছে সে। কেমন যেন কান্না কান্না আসতে লাগল আমার।

চিঠিটা আমরা গেটের দারোয়ানের মাধ্যমে বড় অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর একটা লোক এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে, তারপর একটা বড় রুমের ভেতর ঢুকলাম আমরা। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'তোমরা তো নূরুলের বন্ধু?'

রিন্টু বলল, 'জি।'

'তোমাদের হেড স্যার আমারও স্যার ছিলেন। তিনি তখন হেড স্যার ছিলেন

না, তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। স্যার চিঠিতে যা যা প্রয়োজন তা লিখে দিয়েছেন। তা নূরুলকে এখানে ডেকে আনব, না তোমরা ওর ওখানে গিয়ে দেখা করবে ওর সঙ্গে।'

'আমরা ওর কাছে যাব।' দোদুল বলল।

'ঠিক আছে। তার আগে তোমাদের দুটো কথা বলি। তোমারা ভেব না নূরুলকে জেলখানার মতো কোনো একটা জায়গায় বন্দি করে রাখা হয়েছে। কিশোর সংশোধন কেন্দ্রটা হলো আসলে কিশোরদের সঠিকভাবে বিকাশ করার একটা কেন্দ্র। তারা যেন আর কোনো অপরাধ না করে, তারা যেন সুস্থভাবে জীবনযাপন করে, এগুলোই শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে।'

'এ-এ-এখানে কাউকে পেটানো হয় না তো?' রিমন বড় অফিসারকে বলল।

'না না, পিটবে কেন?' বড় অফিসার হাসতে হাসতে বললেন।

'না খাইয়ে রাখা হয় না তো?

'মোটেই না।'

'কোনো কঠিন কাজ করানো হয় না তো ওকে দিয়ে?'

'না বাবা, না।' বড় আফিসার হাসতে লাগলেন।

বড় অফিসার সাহেব একটা লোককে আমাদের সঙ্গে পাঠালেন নূরুলের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কয়েকটা রুম পার হওয়ার পর লোকটা আমাদের একটা ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনারা ভেতরে যান, আপনাদের বন্ধু ভেতরেই আছেন।' বলেই লোকটা চলে গেলেন।

ঘরের চাপা দেওয়া দরজাটা খুলেই আমরা থমকে দাঁড়ালাম। একটা চেয়ারে বসে নূরুল একটা বই পড়ছিল, দরজা খোলার শব্দে ও ঘুরে তাকাল আমাদের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ও এমনভাবে আমাদের দিকে তাকাল, যেন ও আমাদের এই প্রথম দেখছে, কোনো দিন আমাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল না ওর, ও আমাদের বন্ধু না।

আমাদের চারজনের পা-ও যেন আটকে গেছে মেঝের সঙ্গে, আমরাও এগিয়ে যেতে পারছি না ওর দিকে। আমরা ভেবেছিলাম নূরুলের মুখটা খুব গম্ভীর দেখব। কিন্তু ওর দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ও মিটিমিটি হাসছে। রিন্টু হঠাৎ দৌড়ে গিয়ে নূরুলকে জাপটে ধরল বুকে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনও। আমরা পাঁচ বন্ধু একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আছি, এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে, কিন্তু আমাদের পাঁচজনের চোখে পানি, আমরা কাঁদছি। বেশ কিছুক্ষণ পর রিন্টু নূরুলের সারা মুখ বোলাতে বোলাতে বলল, 'তুই কেমন আছিস নূরুল?'

হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে নূরুল বলল, 'ভালো, খুব ভালো।'

'একা একা তোর খারাপ লাগে না?'

নূরুল হেসে হেসে বলে, 'তোদের লাগে না?'

'খুব লাগে।'

'আমারও লাগে।'

দোদুল ওর ব্যাগ থেকে চুইংগাম, মিমি, চিপস, চকলেট আর বিস্কুটের প্যাকেট দুটো বের করে নূরুলের হাতে দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি এগুলো খেয়ে শেষ করবি।'

'এগুলো আবার আনলি কেন?'

'আমরা চারজন মিলে এনেছি।'

'বুঝলাম তো।' নূরুল টেবিলের পাশ থেকে আরেকটা প্যাকেট বের করে বলল, 'কাল বড় অফিসার সাহেব এগুলো দিয়ে গেছেন, আজ সকালে আবার হেড স্যার আর রশীদ স্যার পাঠিয়েছেন, আবার তোরাও আনলি। এসব খেতে খেতে তো পেট ফুলে মরে যাব।'

'না মরে যাবি না। আরো ছেলে আছে না এখানে, ওদের দিস।'

'আমার বয়সী বেশ কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ওদের লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলাম—অঙ্ক একদম পারে না রে। বড় অফিসার সাহেবকে বলেছি, তিনি বই খাতা কলম দিয়ে যাবেন, কাল থেকে ওদের অঙ্ক শেখাব।'

'বাব্বাহ্, তুই তো তাহলে স্যার হয়ে যাবি, ওরা তোকে স্যার স্যার বলে ডাকবে!'

'ধ্যাত, তা ডাকবে কেন, নূরুল বলেই ডাকবে।'

'পড়াতে খুব ভালো লাগে তোর?'

'পড়াতে ভালো লাগে না, শুধু অঙ্ক করাতে ভালো লাগে। ও, ভালো কথা, আজকেই তো সন্ত্রাসীদের আস্তানায় একটা লোক ধরে আনা হবে, কিছু করতে হবে না আমাদের?' নূরুল চোখ দুটো বড় বড় করে বলল।

'তুই নেই, আমরা তাই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।' রিন্টু গম্ভীর মুখে বলল।

'না না, তোদের যেতে হবে। একটা মানুষের জীবন বাঁচাতে হবে।'

'তোকে ছাড়াই যাব?'

'হ্যাঁ যাবি।'

নূরুল হাসতে হাসতে আমাদের চারজনের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল, আমরাও ওর চুলগুলো এলোমেলো করে দিলাম। নূরুল হাসছে। কী অপূর্ব

হাসি! মনেই হচ্ছে না, একটু পর আমরা ওকে ছেড়ে চলে যাব, আর ও একা একা বসে থাকবে এখানে!

সন্ত্রাসীদের আস্তানার কাছে আমরা যখন পৌছলাম, তখন রাত প্রায় দেড়টা। আজ এখানে আসতে দেরি হয়েছে। কারণ দোদুল আজ সঠিক সময়ে বাসা থেকে বের হতে পারেনি। ওর বাবা নাকি আজ জেগে ছিলেন, তিনি নাকি রাত জেগে টিভিতে কিসের যেন খবর দেখছিলেন আর শুনছিলেন।

রিন্টু দেয়ালের ভাঙা দিয়ে ঢোকার আগে আমাদের ফিস ফিস করে বলল, 'ঠিক দুইটার মধ্যে আমাদের যা করার তা করতে হবে।'

আমি বললাম, 'দুইটার মধ্যে কেন?

'কারণ আছে, আর কারণটা আমি পরে বলছি। তার আগে আমরা আমাদের পরিকল্পনাটা আবার বলে নেই। আমি ভেতরে গিয়ে প্রথমে অবস্থাটা বুঝে নেব। তারপর অবস্থা বুঝে আমি সন্ত্রাসী চারজনের একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।'

'কীভাবে সেটা করবি?' দোদুল বলল।

'ইটের একটা টুকরা দিয়ে আমি ঢিল মারতে পারি।'

'তাহলে কি একটা মুখোশ পরে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ভালো হতো না?' আমি বললাম।

'না হতো না। আমরা চাইছি কি, আমাদের দেখে ওই চারজন সন্ত্রাসীর তিনজন আমাকে ধরার জন্য দৌড়ে আসবে, আর আমি সারা বাড়ি দৌড়াতে থাকব ওদের ফাঁকি দিয়ে, যেন ওরা আমাকে ধরতে না পারে। এরই মধ্যে তোরা তিনজন ভেতরে ঢুকে চুপি চুপি সন্ত্রাসীদের ওস্তাদকে ধরে বেঁধে ফেলবি।'

'ওস্তাদটা দৌড়াবে না তোকে দেখে?'

'ওস্তাদরা কখনো দৌড়ান না, তারা শুধু বসে থাকে আর চেলা-চামুন্ডাদের হুকুম দেন। তাই আমি যদি এই এত রাতে মুখোশ পরে ওদের সামনে দাড়াই তাহলে ওরা আমাকে ভূত ভেবে ওরাই দৌড়ে পালিয়ে যাবে আর ওদের ধরার জন্য আমাদেরকেই তখন ওদের পেছনে দৌড়াতে হবে।'

'কথাটা ঠিক বলেছিস।' দোদুল মাথা কাত করে বলল।

'তাহলে আমি এখন ভেতরে ঢুকি। ঢুকেই আমি যখন ভূত দেখার মতো একটা চিৎকার করে উঠব, ঠিক তখনই তোরা খুব দ্রুত কিন্তু নিঃশব্দে ভেতরে

ঢুকে যাবি। রিমন যে দড়ি এনেছে তা দিয়ে সুযোগ বুঝে বেঁধে ফেলবি ওস্তাদকে। পারলে যে লোকটাকে অপহরণ করে এখানে আনা হয়েছে, সে যদি দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে, তাহলে তাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করবি। তারপর চারজন মিলে ওস্তাদকে টাইট করে আটকে রাখবি, পারবি না?'

'অ-অ-অবশ্যই।' রিমন খুব সাহসী ভঙ্গিতে কথাটা বলল।

রিন্টু আমাদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে যাবার সময় বলল, ' নূরুলকে ছাড়া এই প্রথম আমরা একটা কাজ করছি, খুব খারাপ লাগছে আমার।'

আমরা বললাম, 'আমাদেরও।'

প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে রিন্টু ভেতরে ঢুকেছে। এখনো শব্দ আসছে না ভেতর থেকে। রিমন ফিসফিস করে বলল, 'কোনো অসুবিধা হলো না তো রিন্টুর?'

দোদুল বলল, 'অসুবিধা হলে জানতাম।'

বুকের ভেতর ধুক ধুক করছে আমাদের। কী জানি হয়, কী জানি হয়। আমি দোদুলের একটা হাত ধরে ফেললাম, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। দোদুল অল্প অল্প কাঁপছে। আমি বললাম, 'কিরে, কাঁপছিস কেন?'

দোদুল অল্প হেসে বলল, 'উত্তেজনায়।'

হঠাৎ রিন্টু চিৎকার করে উঠল শব্দ করে, সঙ্গে সঙ্গে দপ দপ শব্দ করে কয়েকজনকে দৌড়ে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল এখান থেকেই। দোদুলও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আর রিমনকে হাত দিয়ে টান দিয়ে ভাঙা দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেল। দেয়ালের কাছে পৌঁছেই দোদুল শেয়ালের মতো দ্রুত ঢুকে গেল ভেতরে, সঙ্গে সঙ্গে আমি আর রিমনও ঢুকলাম।

পা টিপে টিপে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ঘরের সেই মোটা দেয়ালের কাছে। দেয়ালের পাশ দিয়ে আরেকটু এগিয়ে যেতেই আমরা সন্ত্রাসীদের ওস্তাদকে দেখতে পেলাম। উত্তেজনায় পায়চারি শুরু করে দিয়েছে সে। তার সামনে একটা টুলের ওপর একটা লোক বসা। দোদুল ফিসফিস করে বলল, 'ওই লোকটাকেই অপহরণ করা হয়েছে।'

'তুই কী করে বুঝলি?' আমি বললাম।

'লোকটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দেখছিস না কেমন ভয় ভয় চোখে বসে আছে।'

'এখন আমরা কী করব?'

'যতক্ষণ না সন্ত্রাসীদের ওস্তাদ তার চেয়ারে বসছে, ততক্ষণ কিছুই করা যাবে না। রিমন দড়িটা আমার কাছে দে তো। আর দীপ্র, তোর কাছে ছুরিটা আছে তো?' দোদুল বলল।

আমি বললাম, 'আছে।'

ওদিকে বাড়ির ওপাশে বড় উঠোনটার মাঝে দৌড়াদৌড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে, চারদিকে অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ সন্ত্রাসীদের একজন বলল, 'পিচ্চি শয়তানটা কই গেল, খুঁজি পাইতাছি না তো।'

মনে মনে হেসে উঠলাম আমরা, রিন্টু তাহলে লুকাতে পেরেছে। এরই মধ্যে সামনে তাকিয়ে দেখি সন্ত্রাসীদের ওস্তাদ তার চেয়ারে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে দোদুল বলল, 'রেডি।' তারপর দড়ির একপাশ আমি ধরলাম, অন্য পাশ দোদুল ধরে দৌড়ে গিয়ে সন্ত্রাসীদের ওস্তাদকে চেয়ারের সঙ্গে পেঁচিয়ে ফেললাম সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই। আমাদের হঠাৎ এই হামলায় একেবারে বোবা হয়ে গেছে সন্ত্রাসীদের ওস্তাদ, চোখ দুটোও বড় বড় হয়ে গেছে তার। মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে সন্ত্রাসীদের ওস্তাদকে দু হাতসহ চেয়ারে সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেছে অপহরণ হওয়া লোকটিও। সে টুলের ওপর বসে আছে এখনো। সন্ত্রাসী ওস্তাদকে বেঁধে ফেলে আমি যখন তার গলার কাছে ছুরিটা ঠেকিয়ে রাখলাম, তখনই তিনি উঠে এলেন। তারপর কোনো কথা না বলে সোজা সন্ত্রাসী ওস্তাদের ভুঁড়ির ওপর প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মারলেন। লাথিটা মেরেই তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন দোদুলকে জড়িয়ে। ঠিক তখনই কোথা থেকে ম্যাজিকের মতো আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াল রিন্টু। তারপর আমার হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে সন্ত্রাসীদের ওস্তাদের গলার আরো কাছে ঠেকিয়ে বেশ চিৎকার করে বলল, 'জুলমত খাঁ, তোমরা হাত উঁচু করে এই ঘরের ভেতর চলে আসো, তোমাদের ওস্তাদ আমাদের হাতে বন্দি। কোনো রকম চালাকি করলে তোমাদের ওস্তাদের গলা ছুরির এক পোচ দিয়ে কেটে ফেলব।'

একটু পর জুলমত খাঁসহ বাকি দুজন মাথার ওপর হাত তুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো ঘরের ভেতর। ঘরের ভেতর ঢুকেই ওদের চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল আরো। ওরা অবাক হয়ে দেখছে—আমরা এতগুলো দুষ্টু-শয়তান ছেলে কোথা থেকে এলাম এতো রাতে!

বাইরে পুলিশের গাড়ি আর বাঁশির শব্দ শোনা গেল হঠাৎ। আমি রিন্টুর দিকে তাকাতেই বলল, 'তোদের বলেছিলাম না, দুইটার মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। তোদের অবশ্য এটা বলা হয়নি, আমার এক আংকেল আছেন পুলিশের বড়

অফিসার। গতকাল তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে আজ রাতে আসতে বলেছিলাম। তিনি বোধহয় এসে গেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে চার সন্ত্রাসীর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাদের চোখগুলো আরো বড় হয়ে গেছে, যেন চোখের মণিগুলো ফুটে বের হয়ে আসবে সেখান থেকে।

কিছুক্ষণ পর সারা বাড়ি ঘিরে ফেলে রিন্টুর আংকেল। হ্যান্ড মাইক দিয়ে তিনি বেশ শব্দ করে বললেন, 'কেউ পালানোর চেষ্টা করবে না, আমরা সমস্ত বাড়ি ঘিরে ফেলেছি। পালানোর চেষ্টা করলেই তাকে গুলি করে মেরে ফেলা হবে।'

খুব সকালে মা আমাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বললেন, 'এই দীপ্র, ওঠ ওঠ।'

ঘুম ঘুম চোখে আমি উঠে বসতেই মা বলল, 'জানিস, কাল রাতে না ডাকাত ধরা পড়েছে। কোথা থেকে ধরা পড়েছে জানিস? আমরা এতোদিন যাকে ভূতের বাড়ি বলে জানতাম, সেটা আসলে ডাকাতদের আস্তানা ছিল। কাল রাতে পুলিশ তাদের সেখান থেকে ধরেছে।'

মার কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম।

সঙ্গে সঙ্গে মা বলল, 'হাসছিস কেন!'

'এমনি।'

'এমনি কেউ হাসে? পাগল কোথাকার। যা তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে তালুকদার বাড়ির সামনে যা। তোর বাবা গিয়েছে ওখানে। তোর স্কুলের স্যাররাও নাকি এসেছেন। ডাকাতদের ওখানে বেঁধে রাখা হয়েছে। তোকে ডাকছেন তোর হেড স্যার।'

দ্রুত হাত-মুখ ধুয়ে আমি চলে এলাম তালুকদার বাড়ির সামনে। রিন্টু, দোদুল, রিমন আগেই এসে গেছে। হেড স্যার একটা চেয়ারে বসে আছেন। পাশে রশীদ স্যারও বসে আছেন। আমাকে দেখে তিনি হেসে ফেললেন। স্যারদের পাশাপাশি রিন্টু, দোদুল, রিমন এবং আমার বাবাও বসে আছেন। চার সন্ত্রাসীর হাত-পা বেঁধে বসে রাখা হয়েছে ঘাসের উপর।

পুলিশ আংকেল এক কোনায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা অনেক দিন ধরে এদের পেছনে লেগেছিলাম, কিন্তু ধরতে পারিনি এদের।'

দোদুলের বাবা বললেন, 'কিন্তু কাল রাতে আপনি এদের ধরলেন কীভাবে?'

পুলিশ আংকেল আমাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'ব্যাপারটা গোপনীয়। মাফ করবেন, আমি আপাতত আপনাদের এটা বলতে পারছি না।'

'কয়েক দিন আগে যে একটা ছেলেকে মেরে ফেলা হয়েছিল ওই বাড়িতে, সেটা কি এরাই করেছে?' রিমনের বাবা সন্ত্রাসীদের দিকে আঙুল তুলে পুলিশ আংকেলকে বললেন।

'জি, এরাই করেছে।'

হঠাৎ একটা লাল টকটকে গাড়ি এসে থামল আমাদের সামনে। গাড়ির ড্রাইভার দ্রুত নেমে গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে দিল। স্যুট-টাই পরা একটা লোক গাড়ি থেকে নামতেই আমরা সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। গতকাল যে লোকটাকে অপহরণ করা হয়েছিল তিনি এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। রিন্টু যেন কুঁচকে গেল, দোদুল কেমন যেন পালাই পালাই করছে, রিমন ফিসফিস করে বলল, 'এবার বোধহয় ধরা পড়ে গেলাম আমরা।'

লোকটাকে দেখেই দোদুলের বাবা বললেন, 'চৌধুরী সাহেব আপনি! আপনার মতো একজন কোটিপতি আমাদের এলাকায়, ভাবতেই পারছি না আমি!'

'আজ হয়তো আপনাদের এই এলাকাতে আমাকে দেখতে পেতেন না, যদি ওই ছেলেগুলো না থাকত।' চৌধুরী আংকেল আমাদের দিকে হাত তুলে দেখালেন।

'ওরা! ওরা কী করেছে আপনার?'

এক নিঃশ্বাসে চৌধুরী আংকেল গত রাতের ঘটনা খুলে বললেন দোদুলের বাবাকে। দোদুলের বাবা কথাটা শুনেই পুলিশ আংকেলকে বললেন, 'অ, আমরা ওদের বকা দেব বলে সেজন্য আপনি ওদের কথা বলতে চাচ্ছিলেন না। সন্ত্রাসীদের আসলে আমাদের ছেলেরাই ধরেছে।'

পুলিশ আংকেল হাসতে হাসতে বললেন, 'ওরা বলতে নিষেধ করেছিল যে!'

চৌধুরী আংকেল দ্রুত আমাদের কাছে এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাদের চারজনকে। তারপর বেশ জোরে জোড়ে বললেন, 'আপনার সবাই শুনে রাখুন, আমি আজ এ চার ছেলেকে দুইটি ক্রিকেট সেট দেব। আর আগামীতে ওরা যা চাইবে আমার কাছে তার সবই দেব আমি ওদের। ওরা এখন থেকে আমার সন্তান, আমার ছেলে। ওরা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। ওরা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওরা না হলে কাল সন্ত্রাসীরা আমাকে মেরেই ফেলত।' চৌধুরী আংকেল কাঁদতে লাগলেন শব্দ করে।

হেড স্যার উঠে এসে চৌধুরী আংকেলকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। রশীদ স্যারও এদিকে এলেন আমাদের দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর চৌধুরী আংকেল বললেন, 'আমি আজ তোমাদের চার জনের ছবি তুলব, তারপর সে ছবিটা প্রত্যেকটি দৈনিক পত্রিকায় ছাপিয়ে দেব আমি। নিচে লিখে দেব—খুদে বীরদের কাণ্ড।'

রিন্টু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আংকেল, আমরা তো ছবি তুলতে পারব না।'

আংকেল আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন বাবা?'

'আমরা চারজন নই, আমরা পাঁচজন। আমাদের আরেকটা বন্ধু আছে। সে এখন আছে অন্য জায়গায়। আমাদের এই যে এত সাহস, সবই ওর জন্য। ও-ই আমাদের সব, ও-ই আমাদের সবকিছু। ওকে যেদিন আমরা একসঙ্গে পাব, সেদিনই আমরা ছবি তুলব।'

আংকেল হেসে হেসে বললেন, 'খুব ভালো বন্ধু বুঝি!'

আমরা চারজনই একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, আত্মার বন্ধু।'

স্কুলে এসেই জানতে পারলাম, পিকনিকটা আজ স্কুলে হচ্ছে না। পিকনিকটা হবে কিশোর সংশোধন কেন্দ্রের সামনে যে মাঠটা আছে সেখানে। তার চেয়েও ভালো কথা হচ্ছে—নূরুল সারা দিন আজ আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে। হেড স্যার ওপর লেবেলে কথা বলে অনুমতি নিয়েছেন। কথাটা শুনে রিন্টু এমন জোরে চিৎকার দিল স্কুলের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা চমকে উঠে থেমে গেল হঠাৎ। তারা ভেবেছে কী না কী হলো। কিন্তু রিন্টু যে নূরুলকে পিকনিকে পাবে বলে আনন্দে চিৎকার দিয়েছে, এটা জানার পর সবাই চিৎকার করা শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর রশীদ স্যার আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাদের চিৎকার দেওয়া দেখতে লাগলেন। তারও কিছুক্ষণ পর হেড স্যার এসে রশীদ স্যারের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ব্যাপার কী?'

রশীদ স্যার হেসে বললেন, 'নূরুলকে পিকনিকে পাবে বলে ওরা আনন্দে চিৎকার করছে। স্যার, আমারও চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে।'

হেড স্যার লজ্জা লজ্জা মুখ করে রশীদ স্যারকে ফিসফিস করে বললেন, 'আমারও।'

কিশোর সংশোধন কেন্দ্রের মাঠের সামনে গিয়েই দেখি নূরুল দাঁড়িয়ে আছে। হেড স্যারের দেওয়া গেঞ্জি ও প্যান্ট পড়েছে। হাতে কালো ঘড়ি, পায়ে চকচকে জুতা। ওকে খুব সুন্দর লাগছে।

দোদুল দৌড়ে গিয়ে নূরুলকে জড়িয়ে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও জড়িয়ে ধরলাম। নূরুল ঘাসের ওপর বসে পড়ল। আমরাও ওর পাশে বসলাম। নূরুলের সারা মুখে হাসি। হাসতে হাসতেই ও আমাদের বলল, 'আগে বল, সন্ত্রাসীদের তোরা ধরলি কীভাবে?'

রিন্টু পাঁচ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করল নূরুলকে। কথাগুলো শুনতে শুনতে নূরুলের চোখ দুটো বড় হয়ে গেল।

ডান দিকে শব্দ হতেই দেখি পলি, ছন্দা, রুবা, বাটলু, মনির এগিয়ে আসছে এদিকে। বাটলু একটু এগিয়ে নিয়ে নূরুলের একটা হাত ধরে বলল, 'তুই কি আমার ওপর এখনো রাগ করে আছিস নূরুল?'

'নাহ্!' নূরুল হাসতে হাসতে বলল, 'তুই কি রাগ করে আছিস?'

'না রে।' বাটলু একটু থেমে বলল, 'তুই কি আমার আমার বন্ধু হবি?'

অদ্ভুত সুন্দর করে হেসে নূরুল বাটলুর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'আমি তো তোকে বন্ধু ভাবি বাটলু।'

বাটলুর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। পকেট থেকে একটা চুইংগামের প্যাকেট বের করে নূরুলের হাতে দিয়ে বলল, 'তোর জন্য এনেছি।'

নূরুল হেসে বলল, 'ধন্যবাদ।'

পলি, ছন্দা, রুবা, মনির, বাটলু বসে আছি আমরা গোল হয়ে। নূরুল তার কিশোর সংশোধন কেন্দ্রের একটার পর একটা গল্প বলছে, মজার মজার গল্প। নূরুল এখানে বেশ কয়েকজনকে অঙ্ক শেখায়। দু'একজন তারচেয়েও বড়, সবাই নাকি তাকে স্যার বলে ডাকে। কথাটা শুনে আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম। কিন্তু পলি বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'স্যার ডাক শুনতে তোর কেমন লাগে রে নূরুল?'

নূরুল মাথা নিচু করে বলল, 'লজ্জা লাগে!'

বিকেল হয়ে গেছে। যার যার বাসায় ফিরতে হবে এখন, নূরুলকেও ফিরতে হবে কিশোর সংশোধন কেন্দ্রে।

হেড স্যার আর রশীদ স্যার এগিয়ে এসে নূরুলকে বললেন, 'নূরুল, কখনো চিন্তা করবি না তুই, আমরা আছি তোর পাশে। তাছাড়া রিন্টু, দোদুল, দীপ্র, রিমনও আছে। সবাই তোকে এত পছন্দ করে!'

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে নূরুল। একটু পর মুখ তুলে হেড স্যারকে বলল, 'স্যার, একটি কথা আপনি প্রায়ই বলেন, জীবন হচ্ছে একটা অঙ্ক। শুধু বইয়ের অঙ্ক মেলালেই হবে না, সুন্দর চিন্তা, সুন্দর কাজ, সুন্দর পরিকল্পনা করে জীবনের অঙ্কও মেলাতে হবে।' নূরুল একটু থেমে বলে, 'স্যার, আমার তো এখন বাবা নেই, আমার কি জীবনের অঙ্কটা মিলবে স্যার?'

হেড স্যারের চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। তিনি নূরুলকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'কে বলল তোর বাবা নেই, আমিই তো তোর বাবা।'

ঝরঝর করে নূরুল কেঁদে ফেলল।

আমরা চলে যাচ্ছি, নূরুল দাঁড়িয়ে আছে কিশোর সংশোধন কেন্দ্রের গেটে। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম। নূরুল তখনো দাঁড়িয়ে আছে গেটে। একটা হাত তুলে আমাদের বিদায় জানাচ্ছে।

রিন্টু হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। চোখ ভিজে গেছে আমাদের তিনজনেরও। কিন্তু নূরুল হাসছে। আমরা কষ্টে মরে যাচ্ছি, আর শয়তানটা মিটিমিটি হাসছে!

## পরিশিষ্ট

নূরুলকে আমরা প্রতিদিন বিকেলে দেখতে যাই। প্রতিদিন ক্লাসে যা পড়ানো হয়, ওর ওখানে গিয়ে আমরা তা ওকে শিখিয়ে দিই। আমাদের মধ্যে দোদুল সবচেয়ে ভালো ইংরেজি পারে, দোদুল ওকে ইংরেজী শেখায়। মাঝে মাঝে আমরা দু-একটা অঙ্ক মেলাতে পারি না, নূরুল আমাদের সে অঙ্ক মিলিয়ে দেয়।

আর মাত্র উনিশ দিন পর নূরুলকে ছেড়ে দেওয়া হবে। হেড স্যার যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন নূরুলের জন্য। রশীদ স্যারও করেছেন অনেক।

মাত্র উনিশ দিন পর আমরা নুরুলকে আবার কাছে পাব। আমরা আবার পাখির বাসা দেখব, পুকুর থেকে মাছ ধরব, নতুন কোনো সন্ত্রাসী ধরব, আবার ক্রিকেট খেলব আমরা, আরো কত কি করব আমরা প্রতিদিন।

কিন্তু উনিশ দিন যেন যেতেই চায় না। একেকটা দিনকে আমাদের এক বছর বলে মনে হয়।

কোনো দিন কোনো দিন নূরুল অল্প অল্প রেগে বলে, 'তোরা প্রতিদিন আসিস কেন, কষ্ট হয় না তোদের!'

আমরা কোনো কথা বলি না। আমরা হেসে ফেলি আর মনে মনে বলি—মানুষ তো বন্ধুর জন্যই কষ্ট করে। আর নূরুল, তুই কি জানিস, তুই আমাদের কত প্রিয় বন্ধু, তোকে আমরা কত ভালোবাসি!